سورة الحجرات

সূরা হুজুরাত

মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত ১৮, রুকূ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝١ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَا
تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ
لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝٢ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ
اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝٣ اِنَّ الَّذِيْنَ
يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝٤ وَلَوْ اَنَّهُمْ
صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে।

(১) মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন। (২) মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেই রূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না। (৩) যারা আল্লাহ্‌র রসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্য শোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (৪) যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উঁচুস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ। (৫) যদি তারা আপনার বের হয়ে তাদের কাছে

আসা পর্যন্ত সবর করত, তবে তা-ই তাদের জন্য মঙ্গলজনক হত। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সূরার যোগসূত্র ও শানে-নুযূল : পূর্ববর্তী দুই সূরায় জিহাদের বিধান ছিল, যদ্দ্বারা বিশ্বজগতের সংশোধন উদ্দেশ্য। আলোচ্য সূরায় আত্মসংশোধনের বিধান ও শিষ্টাচার নীতি ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষত সামাজিকতা সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতরণের ঘটনা এই যে, একবার বনী তামীম গোত্রের কিছু লোক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়। এই গোত্রের শাসনকর্তা কাকে নিযুক্ত করা হবে——তখন এ বিষয়েই আলোচনা চলছিল। হযরত আবূ বকর (রা) কা'কা' ইবনে হাকিমের নাম প্রস্তাব করলেন এবং হযরত ওমর (রা) আকরা' ইবনে হাবেসের নাম পেশ করলেন। এ ব্যাপারে হযরত আবূ বকর (রা) ও ওমর (রা)-এর মধ্যে মজলিসেই কথাবার্তা হল এবং ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত কথা কাটাকাটিতে উন্নীত হয়ে উভয়ের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে গেল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।——(বুখারী)

মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের (অনুমতির) আগে (কোন কথা কিংবা কাজে) অগ্রণী হয়ো না। [অর্থাৎ যে পর্যন্ত শক্তিশালী ইঙ্গিতে অথবা স্পষ্ট ভাষায় কথাবার্তার অনুমতি না হয়, কথাবার্তা বলো না; যেমন উপরোক্ত ঘটনায় অপেক্ষা করা উচিত ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে কিছু বলুন অথবা উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। এরূপ অপেক্ষা না করেই নিজের পক্ষ থেকে কথাবার্তা শুরু করে দেওয়া সমীচীন ছিল না]। আল্লা-হ্কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ (তোমাদের সব কথাবার্তা) শুনেন (এবং তোমাদের ক্রিয়া-কর্ম) জানেন। মু'মিনগণ, তোমরা পয়গম্বরের কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা পরস্পরে যেমন খোলাখুলি কথাবার্তা বল, পয়গম্বরের সাথে সেরূপ খোলাখুলি কথাবার্তা বলো না। (অর্থাৎ পরস্পরে কথা বলার সময় তাঁর সামনে উঁচুস্বরে কথা বলো না এবং স্বয়ং তাঁর সাথে কথা বলার সময় সমান স্বরে বলো না)। এতে তোমাদের কর্ম তোমাদের অজ্ঞাতসারে নিষ্ফল হয়ে যাবে। [উদ্দেশ্য এই যে, দৃশ্যত নির্ভীক ও বেপরোয়া হয়ে কথা বলা এবং পরস্পরে খোলাখুলি কথা বলার অনুরূপ উঁচুস্বরে কথা বলা এক প্রকার ধৃষ্টতা। অনুসারী ও খাদিমের পক্ষ থেকে এ ধরনের কথাবার্তা অপছন্দ-নীয় ও কষ্টদায়ক হতে পারে। আল্লাহ্র রসূলকে কষ্ট দেওয়া যাবতীয় সৎকর্মকে বরবাদ করে দেওয়ার নামান্তর। তবে মাঝে মাঝে মানসিক প্রফুল্লতার সময় এরূপ ব্যবহার অসহনীয় হয় না। তখন রসূলের জন্য কষ্টদায়ক না হওয়ার কারণে এ ধরনের কথাবার্তা সৎকর্ম বরবাদ হওয়ার কারণ হবে না। কিন্তু এ ধরনের কথাবার্তা কখন অসহনীয় ও কষ্টদায়ক হবে না, তা জানা বক্তার পক্ষে সহজ নয়। বক্তা হয়ত এরূপ মনে করে কথা বলবে যে, এই কথায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কষ্ট হবে না; কিন্তু বাস্তবে তা দ্বারা কষ্ট হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তার কথা তার সৎ কর্মকে বরবাদ করে দেবে; যদিও সে ধারণাও করতে পারবে না যে, তার এই কথা দ্বারা তার কতটুকু ক্ষতি হয়ে গেছে। তাই কণ্ঠস্বর উঁচু করতে

এবং জোরে কথা বলতে সর্বাবস্থায় নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, এ ধরনের কিছু সংখ্যক কথাবার্তা যদিও কর্ম বরবাদ হওয়ার কারণ নয়; কিন্তু তা নির্দিষ্ট করা কঠিন। তাই যাবতীয় খোলাখুলি কথাবার্তাই বর্জন করা বিধেয়। এ পর্যন্ত উঁচুস্বরে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর কণ্ঠস্বর নীচু করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে ঃ]

নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র রসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ তাদের অন্তরে তাকওয়ার পরিপন্থী কোন বিষয় আসেই না ঃ উদ্দেশ্য এরূপ মনে হয় যে, এই বিশেষ ব্যাপারে তাঁরা পূর্ণ তাকওয়া গুণে গুণান্বিত। তিরমিযীর এক হাদীসে পূর্ণ তাকওয়ার বর্ণনা এরূপ ভাষায় বিবৃত হয়েছে ঃ لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به اخذوا لما به باس অর্থাৎ বান্দা ততক্ষণ পূর্ণ তাকওয়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে গোনাহ্ নয়, এমন কিছু বিষয়ও বর্জন করে। এই ভয়ে যে, এগুলো তাকে গোনাহে লিপ্ত করে দিতে পারে। অর্থাৎ গোনাহের আশংকা আছে, এমন বিষয়াদিকেও সে বর্জন করে। উদাহরণত কণ্ঠস্বর উঁচু করার এমন এক প্রকার আছে, যাতে গোনাহ্ নেই। অর্থাৎ যদ্দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির কষ্ট হয় না এবং এক প্রকার এমন আছে, যাতে গোনাহ্ আছে, অর্থাৎ যদ্দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির কষ্ট হয়। এখন পূর্ণ তাকওয়া হল সর্বাবস্থায় কণ্ঠস্বর উঁচু করাকে বর্জন করা। অতঃপর তাদের কর্মের পারলৌকিক ফায়দা বর্ণিত হচ্ছে ঃ) তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহের ঘটনা এই যে, এই বনী তামীম গোত্রই যখন পুনরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়, তখন তিনি বাড়ীর বাইরে ছিলেন না। বরং বিবিগণের কোন এক কক্ষে ছিলেন। তারা ছিল আনাড়ি গ্রাম্য লোক। সেমতে বাইরে দাঁড়িয়েই তাঁর নাম উচ্চারণ করে ডাকতে লাগল ঃ

يا محمد اخرج الينا হে মুহাম্মদ, আমাদের কাছে বের হয়ে আসুন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।—(দুররে মনসূর) যারা কক্ষের বাইরে থেকে আপনাকে চিৎকার করে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ (বুদ্ধিমান হলে আপনার সাথে শিষ্টাচারমূলক ব্যবহার করত এবং এভাবে নাম নিয়ে বাইরে থেকে ডাকার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত না। اكثرهم বলার কারণ হয় এই যে, তাদের কেউ কেউ আসলে অবুঝ ছিল না, অন্যের দেখাদেখি এ কাজে লিপ্ত হয়েছিল। না হয় যাতে কেউ উত্তেজিত না হয়, সেজন্য اكثرهم বলা হয়েছে। কেননা, এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই ধারণা করতে পারে যে, বোধ হয় তাকে লক্ষ্য করে বলা হয়নি। ওয়ায-নসিহতের ক্ষেত্রে উত্তেজনাকর কথাবার্তা থেকে সাবধান থাকাই নিয়ম)। যদি তারা আপনার বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত (সামান্য) সবর (ও অপেক্ষা) করত, তবে এটা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হত (কেননা এটাই ছিল শিষ্টাচারের কথা। তারা এখনও তওবা করলে ক্ষমা পাবে, কেননা,) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের অবতরণ সম্পর্কে কুরতুবীর ভাষ্য অনুযায়ী ছয়টি ঘটনা বর্ণিত আছে। কাযী আবূ বকর ইবনে আরাবী (র) বলেনঃ সব ঘটনা নির্ভুল। কেননা, সবগুলোই আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে একটি ঘটনা বুখারীর বর্ণনা মতে তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ — بَيْنَ الْيَدَيْنِ এর আসল অর্থ দুই হাতের মধ্যস্থল। এর উদ্দেশ্য সামনের দিক। অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না। কি বিষয়ে অগ্রণী হতে নিষেধ করা হয়েছে, কোরআন পাক তা উল্লেখ করেনি। এতে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ যে কোন কথায় অথবা কাজে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে অগ্রণী হয়ো না। বরং তাঁর জওয়াবের অপেক্ষা কর। তবে তিনিই যদি কাউকে জওয়াবদানের আদেশ করেন, তবে সে জওয়াব দিতে পারে। এমনিভাবে যদি তিনি পথ চলেন তবে কেউ যেন তাঁর অগ্রে না চলে। খাওয়ার মজলিসে কেউ যেন তাঁর আগে খাওয়া শুরু না করে। তবে তাঁর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বর্ণনা অথবা শক্তিশালী ইঙ্গিত দ্বারা যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি কাউকে অগ্রে প্রেরণ করতে চান তবে তা ভিন্ন কথা ; যেমন সফর ও যুদ্ধের বেলায় কিছু সংখ্যক লোককে অগ্রে যেতে আদেশ করা হত।

আলিম ও ধর্মীয় নেতাদের সাথেও এই আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিতঃ কেউ কেউ বলেন, ধর্মের আলিম ও মাশায়েখের বেলায়ও এই বিধান কার্যকর। কেননা, তাঁরা পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী। নিম্নোক্ত ঘটনা এর প্রমাণ। একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবুদ্দারদা (রা)-কে হযরত আবূ বকর (রা)-এর অগ্রে অগ্রে চলতে দেখে সতর্ক করলেন এবং বললেনঃ তুমি কি এমন ব্যক্তির অগ্রে চল, যিনি ইহকাল ও পরকালে তোমা থেকে শ্রেষ্ঠ? তিনি আরও বললেনঃ দুনিয়াতে এমন কোন ব্যক্তির উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়নি যে পয়গম্বরগণের পর হযরত আবূ বকর থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।—(রূহুল-বয়ান) তাই আলিমগণ বলেন যে, ওস্তাদ ও পীরের সাথেও এই আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ — নবী করীম (সা)-এর মজলিসের এটা দ্বিতীয় আদব। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে কণ্ঠস্বরকে তাঁর কণ্ঠস্বরের চাইতে অধিক উঁচু করা অথবা তাঁর সাথে উঁচুস্বরে কথা বলা—যেমন পরস্পরে বিনা দ্বিধায় করা হয়, এক প্রকার বে-আদবী ও ধৃষ্টতা। সেমতে এই আয়াত অবতরণের পর সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা পাল্টে যায়। হযরত আবূ বকর (রা) আরয করেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা), আল্লাহ্র কসম! এখন মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাথে কানাকানির অনুরূপ কথাবার্তা বলব।—(বায়হাকী) হযরত ওমর (রা) এরপর থেকে এত আস্তে কথা বলতেন যে, প্রায়ই পুনরায় জিজ্ঞাসা করতে হত। —(সেহাহ্) হযরত সাবেত ইবনে কায়সের কণ্ঠস্বর স্বভাবগতভাবেই উঁচু ছিল। এই আয়াত শুনে তিনি ভয়ে ক্রন্দন করলেন এবং কণ্ঠস্বর নীচু করলেন।—(দুররে-মনসূর)

রওযা মোবারকের সামনেও বেশী উঁচুস্বরে সালাম ও কালাম করা নিষিদ্ধ ঃ কাযী আবূ বকর ইবনে আরাবী (র) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান ও আদব তাঁর ওফাতের পরও জীবদ্দশার ন্যায় ওয়াজিব। তাই কোন কোন আলিম বলেন ঃ তাঁর পবিত্র কবরের সামনেও বেশী উঁচুস্বরে সালাম ও কালাম করা আদবের খিলাফ। এমনভাবে যে মজলিসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাদীস পাঠ অথবা বর্ণনা করা হয়, তাতেও হট্টগোল করা বেআদবী। কেননা, তাঁর কথা যখন তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত হত, তখন সবার জন্য চুপ করে শোনা ওয়াজিব ও জরুরী ছিল। এমনিভাবে ওফাতের পর যে মজলিসে বাক্যাবলী শুনানো হয়, সেখানে হট্টগোল করা বেআদবী।

মাস'আলা ঃ পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে পয়গম্বরের উপর অগ্রণী হওয়ার নিষেধাজ্ঞায় যেমন আলিমগণ দাখিল আছেন, তেমনিভাবে আওয়ায উঁচু করারও বিধান তাই। আলিমগণের মজলিসে এত উঁচুস্বরে কথা বলবে না, যাতে তাঁদের আওয়ায চাপা পড়ে যায়।—(কুরতুবী)

أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ —অর্থাৎ তোমাদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বর থেকে উঁচু করো না এই আশংকার কারণে যে, কোথাও তোমাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে যায় এবং তোমরা টেরও পাও না। এ স্থলে শরীয়তের স্বীকৃত মূলনীতির দিক দিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয় ঃ এক. আহলে সুন্নত ওয়াল জমাআতের ঐকমত্যে একমাত্র কুফরই সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দেয়। কোন গোনাহের কারণে কোন সৎ কর্ম বিনষ্ট হয় না। এখানে মু'মিন তথা সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا শব্দযোগে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, কাজটি কুফর নয়। অতএব আমলসমূহ বিনষ্ট হবে কিরূপে? দুই. ঈমান একটি ইচ্ছাধীন কাজ। যে পর্যন্ত কেউ স্বেচ্ছায় ঈমান গ্রহণ না করে, মু'মিন হয় না। এমনিভাবে কুফরও একটি ইচ্ছাধীন কাজ। স্বেচ্ছায় কুফর অবলম্বন না করা পর্যন্ত কেউ কাফির হতে পারে না। এখানে আয়াতের শেষাংশে স্পষ্টত أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা টেরও পাবে না। অতএব এখানে খাঁটি কুফরের শাস্তি সমস্ত নেক আমল নিষ্ফল হওয়া কিরূপে প্রযোজ্য হতে পারে।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বয়ানুল কোরআনে এর এমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যদ্দ্বারা সব প্রশ্ন দূর হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, আয়াতের অর্থ এই যে, মুসলমানগণ, তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কণ্ঠস্বর থেকে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করা এবং উচ্চস্বরে কথা বলা থেকে বিরত থেকো। কারণ, এতে তোমাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট ও নিষ্ফল হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। আশংকার কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে অগ্রণী হওয়া

অথবা তাঁর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করার মধ্যে তাঁর শানে ধৃষ্টতা ও বেআদবী হওয়ারও আশংকা আছে, যা রসূলকে কষ্টদানের কারণ। রসূলের কষ্টের কারণ হয়, এরূপ কোন কাজ সাহাবায়ে কিরাম ইচ্ছাকৃতভাবে করবেন, যদিও এরূপ কল্পনাও করা যায় না, কিন্তু অগ্রণী হওয়া ও কণ্ঠস্বর উঁচু করার মত কাজ কষ্টদানের ইচ্ছায় না হলেও তদ্দ্বারা কষ্ট পাওয়ার আশংকা আছে। তাই এই জাতীয় কাজ সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ও গোনাহ্ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোন গোনাহের বৈশিষ্ট্য এই যে, যারা এই গোনাহ্ করে, তাদের থেকে তওবা ও সৎ কর্মের তওফীক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ফলে তারা গোনাহে অহর্নিশি মগ্ন হয়ে পরিণামে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যা সমস্ত নেক আমল নিষ্ফল হওয়ার কারণ। ধর্মীয় নেতা, ওস্তাদ অথবা পীরকে কষ্ট দেওয়া এমনি গোনাহ্, যদ্দ্বারা তওফীক ছিনিয়ে নেওয়ার আশংকা আছে। এভাবে নবীর সামনে অগ্রণী হওয়া এবং কণ্ঠস্বর উঁচু করা দ্বারাও তওফীক ছিনিয়ে নেওয়ার এবং অবশেষে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার আংশকা থাকে। ফলে সমস্ত সৎকর্ম নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে। যারা এহেন কাজ করে, তারা যেহেতু কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছায় করে না, তাই সে টেরও পাবে না যে, এই কুফর ও সৎ কর্ম নিষ্ফল হওয়ার আসল কারণ কি ছিল। কোন কোন আলিম বলেনঃ বুযুর্গ পীরের সাথে ধৃষ্টতা ও বেআদবী ও মাঝে মাঝে তওফীক ছিনিয়ে নেওয়ার কারণ হয়ে যায়, যা পরিণামে ঈমানের সম্পদও বিনষ্ট করে দেয়।

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

—এই আয়াতে নবী করীম (সা)-এর তৃতীয় আদব শেখানো হয়েছে। অর্থাৎ তিনি যখন নিজ বাসগৃহে তশরীফ রাখেন, তখন বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডাকা, বিশেষত গেঁায়ার্তুমি সহকারে নাম নিয়ে আহবান করা বেআদবী। এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। حجرات শব্দটি حجرة-এর বহুবচন। অভিধানে প্রাচীর চতুষ্টয় দ্বারা বেষ্টিত স্থানকে حجرة বলা হয়, যাতে কিছু বারান্দা ও ছাদ থাকে। নবী করীম (সা)-এর নয়জন বিবি ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক হুজরা তথা কক্ষ ছিল। তিনি পালাক্রমে এসব হুজরায় তশরীফ রাখতেন।

ইবনে সা'দ আতা খোরাসানীর রেওয়ায়েতক্রমে লিখেনঃ এসব হুজরা খর্জুর শাখা দ্বারা নির্মিত ছিল এবং দরজায় মোটা কাল পশমী পর্দা ঝুলানো থাকত। ইমাম বোখারী (র) 'আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে এবং বায়হাকী দাউদ ইবনে কায়েসের উক্তি বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমি এসব হুজরার যিয়ারত করেছি। আমার ধারণা এই যে, হুজরার দরজা থেকে ছাদবিশিষ্ট কক্ষ পর্যন্ত ছয়-সাত হাতের ব্যবধান ছিল। কক্ষ দশ হাত এবং ছাদের উচ্চতা সাত-আট হাত ছিল। ওলীদ ইবনে আবদুল মালেকের রাজত্বকালে তাঁরই নির্দেশে এসব হুজরা মসজিদে নববীর অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। মদীনার লোকগণ সেদিন অশ্রু রোধ করতে পারেন নি।

শানে-নুযূলঃ ইমাম বগভী (র) কাতাদাহ্ (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন,

বনূ তামীমের লোকগণ দুপুরের সময় মদীনায় উপস্থিত হয়েছিল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন এক হুজরায় বিশ্রামরত ছিলেন। তারা ছিল গ্রাম্য এবং সামাজিকতার রীতি-নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ। কাজেই তারা হুজরার বাইরে থেকেই ডাকাডাকি শুরু করল ঃ اخرج الينا يا محمد—এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে এভাবে ডাকা-ডাকি করতে নিষেধ করা হয় এবং অপেক্ষা করার আদেশ দেওয়া হয়। মসনদে আহমদ, তিরমিযী ইত্যাদি গ্রন্থেও এই রেওয়ায়েত বিভিন্ন শব্দযোগে বর্ণিত হয়েছে।—(মাযহারী)

সাহাবী ও তাবেয়ীগণ তাঁদের আলিম ও মাশায়েখের সাথেও এই আদব ব্যবহার করেছেন। সহীহ্ বোখারী ও অন্যান্য কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে—আমি যখন কোন আলিম সাহাবীর কাছ থেকে কোন হাদীস লাভ করতে চাইতাম, তখন তাঁর গৃহে পৌঁছে ডাকাডাকি অথবা দরজার কড়া নাড়া দেওয়া থেকে বিরত থাকতাম এবং দরজার বাইরে বসে অপেক্ষা করতাম। তিনি যখন নিজেই বাইরে আগমন করতেন, তখন আমি তাঁর কাছে হাদীস জিজ্ঞাসা করতাম। তিনি আমাকে দেখে বলতেন ঃ হে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র চাচাত ভাই, আপনি দরজার কড়া নেড়ে আমাকে সংবাদ দিলেন না কেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর উত্তরে বলতেন ঃ আলিম জাতির জন্য পয়গম্বর সদৃশ। আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বর সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁর বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। হযরত আবূ ওবায়দা (র) বলেন ঃ আমি কোন দিন কোন আলিমের দরজায় যেয়ে কড়া নাড়া দিইনি; বরং অপেক্ষা করেছি যে, তিনি নিজেই বাইরে আসলে সাক্ষাৎ করব।—(রূহুল-মা'আনী)

মাস'আলা ঃ আলোচ্য আয়াতে اِلَيْهِمْ কথাটি যুক্ত হওয়ায় প্রমাণিত হয় যে, ততক্ষণ সবর ও অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ তিনি আগন্তুকদের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য বাইরে আসেন। যদি অন্য কোন প্রয়োজনে তিনি বাইরে আসেন, তখনও নিজের মতলব সম্পর্কে কথা বলা সমীচীন নয়; বরং তিনি নিজে যখন আগন্তুকদের প্রতি মনোনিবেশ করেন, তখন বলতে হবে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟
قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ ﴿٦﴾

---

(৬) মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, (যাতে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে) তবে (যথার্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যতিরেকে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করো না; বরং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে) তা খুব পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-নুযূল ঃ মসনদে আহমদের বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর এই আয়াত অবতরণের ঘটনা এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, বনূ মুস্তালিক গোত্রের সরদার, উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-র পিতা হারেস ইবনে মেরার বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং যাকাত প্রদানের আদেশ দিলেন। আমি ইসলামের দাওয়াত কবূল করে যাকাত প্রদানে স্বীকৃত হলাম এবং বললাম ঃ এখন আমি স্বগোত্রে ফিরে গিয়ে তাদেরকেও ইসলাম ও যাকাত প্রদানের দাওয়াত দেব। যারা আমার কথা মানবে এবং যাকাত দেবে, আমি তাদের যাকাত একত্র করে আমার কাছে জমা রাখব। আপনি অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্যন্ত কোন দূত আমার কাছে প্রেরণ করবেন, যাতে আমি যাকাতের জমা অর্থ তার হাতে সোপর্দ করতে পারি। এরপর হারেস যখন ওয়াদা অনুযায়ী যাকাতের অর্থ জমা করলেন এবং দূত আগমনের নির্ধারিত মাস ও তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোন দূত আগমন করল না, তখন হারেস আশংকা করলেন যে, সম্ভবত রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কারণে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। নতুবা ওয়াদা অনুযায়ী দূত না পাঠানো কিছুতেই সম্ভবপর নয়। হারেস এই আশংকার কথা ইসলাম গ্রহণকারী নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছেও প্রকাশ করলেন এবং সবাই মিলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা করলেন। এদিকে রসূলুল্লাহ্ (সা) নির্ধারিত তারিখে ওলীদ ইবনে ওকবা (রা)-কে যাকাত গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পথিমধ্যে ওলীদ ইবনে ওকবা (রা)-র মনে এই ধারণা জাগ্রত হয় যে, এই গোত্রের লোকদের সাথে তাঁর পুরাতন শত্রুতা আছে। কোথাও তাঁরা তাকে পেয়ে হত্যা না করে ফেলে। এই ভয়ের কথা চিন্তা করে তিনি সেখান থেকেই ফিরে আসেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যেয়ে বলেন যে, তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করারও ইচ্ছা করেছে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) রাগান্বিত হয়ে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-এর নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ প্রেরণ করলেন। এদিক দিয়ে মুজাহিদ বাহিনী রওয়ানা হল এবং ওদিক থেকে হারেস তাঁর সঙ্গিগণসহ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খেদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য বের হলেন। মদীনার অদূরে উভয় দল মুখোমুখি হল। মুজাহিদ বাহিনী দেখে হারেস জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনারা কোন্ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন? উত্তর হল ঃ আমরা তোমাদের প্রতিই প্রেরিত হয়েছি। হারেস কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে ওলীদ ইবনে ওকবা (রা)-কে প্রেরণ ও তাঁর প্রত্যাবর্তনের কাহিনী শুনানো হল এবং ওয়ালীদের এই বিবৃতিও শুনানো হল যে, বনূ মুস্তালিক গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাঁকে

হত্যার পরিকল্পনা করেছে। একথা শুনে হারেস বললেন ঃ সেই আল্লাহ্‌র কসম, যিনি মুহাম্মদ (সা)-কে সত্য রসূল করে প্রেরণ করেছেন, আমি ওলীদ ইবনে ওকবাকে দেখি-ওনি। সে আমার কাছে যায়নি। অতঃপর হারেস রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি যাকাত দিতে অস্বীকার করেছ এবং আমার দূতকে হত্যা করতে চেয়েছ? হারেস বললেন ঃ কখনই নয়, সেই আল্লাহ্‌র কসম, যিনি আপনাকে সত্য পয়গামসহ প্রেরণ করেছেন, সে আমার কাছে যায়নি এবং আমি তাকে দেখিওনি। নির্ধারিত সময়ে আপনার দূত যায়নি দেখে আমার আশংকা হয় যে, বোধ হয়, আপনি কোন ত্রুটির কারণে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই আমরা খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। হারেস বলেন, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা হুজুরাতের আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।---(ইবনে-কাসীর)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ওলীদ ইবনে ওকবা (রা) নির্দেশ অনুযায়ী বনু মুস্তালিক গোত্রে পৌঁছেন। গোত্রের লোকেরা পূর্বেই জানত যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দূত অমুক তারিখে আগমন করবে। তাই তারা অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে বস্তি থেকে বের হয়ে আসে। ওলীদ সন্দেহ করলেন যে, তারা বোধ হয় পুরাতন শত্রুতার কারণে তাকে হত্যা করতে এগিয়ে আসছে। সেমতে তিনি সেখান থেকেই ফিরে আসেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে নিজ ধারণা অনুযায়ী আরয করলেন যে, তারা যাকাত দিতে সম্মত নয়; বরং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে প্রেরণ করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) রাত্রি বেলায় বস্তির নিকটে পৌঁছে গোপনে কয়েকজন গুপ্তচর পাঠিয়ে দিলেন। তারা ফিরে এসে সংবাদ দিল যে, তারা সবাই ইসলাম ও ঈমানের উপর কায়েম এবং যাকাত দিতে প্রস্তুত আছে। তাদের মধ্যে ইসলামের বিপরীত কোন কিছু নেই। খালিদ (রা) ফিরে এসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (এটা ইবনে কাসীরের একাধিক রেওয়ায়েতের সার-সংক্ষেপ)।

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন দুষ্ট ও পাপাচারী ব্যক্তি যদি কোন লোক কিংবা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে, তবে যথোপযুক্ত তদন্ত ব্যতি-রেকে তার সংবাদ অথবা সাক্ষ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়।

আয়াত সম্পর্কিত বিধান ও মাস'আলা ঃ ইমাম জাসসাস আহকামুল-কোরআনে বলেন ঃ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন ফাসিক ও পাপাচারীর খবর কবুল করা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়, যে পর্যন্ত না অন্যান্য উপায়ে তদন্ত করে তার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়। কেননা, এই আয়াতে এক কিরাআত হচ্ছে ঃ فَتَثَبَّتُوا

অর্থাৎ তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তড়িঘড়ি করো না; বরং অন্য উপায়ে এর সত্যতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত দৃঢ়পদ থাক। ফাসিকের খবর কবুল করা যখন না-জায়েয তখন সাক্ষ্য কবুল করা আরও উত্তমরূপে নাজায়েয হবে। কেননা, সাক্ষ্য এমন একটি খবর,

যাকে শপথ ও কসম দ্বারা জোরালো করা হয়। এ কারণেই অধিকাংশ আলিমের মতে ফাসিকের খবর অথবা সাক্ষ্য শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কোন কোন ব্যাপারে ফাসিকের খবর ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সেটা এই বিধানের ব্যতিক্রম। কেননা, আয়াতে এই বিধানের একটি বিশেষ কারণ ان تصيبوا قوما بجهالة বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব যেসব ব্যাপারে এই কারণ অনুপস্থিত, সেগুলো আয়াতের বিধানে দাখিল নয়, অথবা এর ব্যতিক্রম। উদাহরণত কোন ফাসিক বরং কাফিরও যদি কোন বস্তু এনে বলে যে, অমুক ব্যক্তি আপনাকে এটা হাদিয়া দিয়েছে, তবে তার এই খবর সত্য বলে মেনে নেওয়া জায়েয। ফিকহ্ গ্রন্থে এর আরও বিবরণ পাওয়া যাবে।

সাহাবীদের আদালত সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও জওয়াব ঃ বিভিন্ন সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, এই আয়াতটি ওলীদ ইবনে ওকবা (রা) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আয়াতে তাকে ফাসিক বলা হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, সাহাবীগণের মধ্যে কেউ ফাসিকও হতে পারে। এটা الصحابة كلهم عدول এই স্বীকৃত ও সর্বসম্মত মূলনীতির পরিপন্থী। অর্থাৎ সকল সাহাবীই সিকাহ্ তথা নির্ভরযোগ্য। তাদের কোন খবর ও সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য নয়। আল্লামা আলূসী (র) রূহুল-মা'আনীতে বলেন ঃ অধিকাংশ আলিম যে মাযহাব ও মতবাদ গ্রহণ করেছেন, এ ব্যাপারে তাই সত্য ও নির্ভুল। তাঁরা বলেন ঃ সাহাবায়ে কিরাম নিষ্পাপ নন, তাঁদের দ্বারা কবীরা গোনাহও সংঘটিত হতে পারে, 'যা ফিসক তথা পাপাচার। এরূপ গোনাহ্ হলে তাঁদের বেলায়ও শরীয়তসম্মত শাস্তি প্রযোজ্য হবে এবং মিথ্যা সাব্যস্ত হলে তাঁদের খবর এবং সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যান করা হবে। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর বর্ণনাদৃষ্টে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআতের আকীদা এই যে, সাহাবী গোনাহ্ করতে পারেন, কিন্তু এমন কোন সাহাবী নেই, যিনি গোনাহ্ থেকে তওবা করে পবিত্র হন নি। কোরআন পাক رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ বলে সর্বাবস্থায় তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছে। গোনাহ্ ক্ষমা করা ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি হয় না। কাযী আবূ ইয়ালা (র) বলেন ঃ সন্তুষ্টি আল্লাহ্ তা'আলার একটি চিরাগত গুণ। তিনি তাদের জন্যই সন্তুষ্টি ঘোষণা করেন, যাদের সম্পর্কে জানেন যে, সন্তুষ্টির কারণাদির উপরই তাদের ওফাত হবে।

সারকথা এই যে, সাহাবায়ে কিরামের বিরাট দলের মধ্য থেকে গুণাগুণতি কয়েকজন দ্বারা কখনও কোন গোনাহ্ হয়ে থাকলেও তাঁরা তাৎক্ষণিক তওবা করার সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হয়েছেন। রসূলে করীম (সা)-এর সংসর্গের বরকতে শরীয়ত তাঁদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ অথবা গোনাহ্ তাঁদের পক্ষ থেকে খুবই দুর্লভ ছিল। তাঁদের অসংখ্য সৎ কর্ম ছিল। নবী করীম (সা) ও ইসলামের জন্য তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূলের অনুসরণকে তাঁরা জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং এ জন্য এমন সাধনা করেছিলেন, যার নজীর অতীত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এসব গুণ ও শ্রেষ্ঠত্বের মুকাবিলায় সারা জীবনের মধ্যে কোন গোনাহ হয়ে গেলেও তা স্বভাবতই ধর্তব্য নয়। এছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর

রসূল (সা)-এর মাহাত্ম্য ও মহব্বতে তাঁদের অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। সামান্য গোনাহ্ হয়ে গেলেও তাঁরা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে পড়তেন এবং তাৎক্ষণিক তওবা করতেন; বরং নিজেকে শাস্তির জন্য নিজেই পেশ করে দিতেন। কোথাও নিজেই নিজেকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে দিতেন। এসব ঘটনা হাদীসে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। হাদীস থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি গোনাহ্ থেকে তওবা করে, সে এমন হয়ে যায় যেন গোনাহ্ করেনি। তৃতীয়ত কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী পুণ্য কাজ নিজেও গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়। বলা হয়েছে : إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ---বিশেষত সাহাবায়ে কিরামের পুণ্যকাজ গোনাহের কাফফারা হবেই। কারণ, তাঁদের পুণ্য কাজ সাধারণ লোকদের মত ছিল না। তাঁদের অবস্থা আবূ দাউদ ও তিরমিযী হযরত সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন :

والله لمشهد رجل منهم مع النبى صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل احدكم ولو عمر عمر نوح -

"আল্লাহ্র কসম, তাঁদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির নবী করীম (সা)-এর সাথে জিহাদে শরীক হওয়া---যাতে তাঁর মুখমণ্ডল ধূলি ধূসরিত হয়ে যায়---তোমাদের সারা জীবনের ইবাদত থেকে উত্তম, যদিও তোমাদেরকে নূহ (আ)-এর আয়ুষ্কাল দান করা হয়।" অতএব গোনাহ্ হয়ে গেলে যদিও তাঁদেরকে নির্ধারিত শাস্তিই দেওয়া হয়, কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোন পরবর্তী ব্যক্তির জন্য তাঁদের কাউকে ফাসিক সাব্যস্ত করা জায়েয নয়। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যুগে কোন সাহাবী দ্বারা ফিসক হওয়ার কারণে তাঁকে ফাসিক বলা হলেও এর কারণে তাঁকে (নাঊযুবিল্লাহ্) পরবর্তীকালেও সর্বদা ফাসিক বলা বৈধ নয়। ---(রূহুল-মা'আনী)

আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ ওলীদ ইবনে ওকবা (রা)-র ঘটনা হলেও আয়াতে তাঁকে ফাসিক বলা হয়েছে---একথা অকাট্যরূপে জরুরী নয়। কারণ, এই ঘটনার পূর্বে ফাসিক বলার মত কোন কাজ তিনি করেন নি। এই ঘটনায়ও নিজ ধারণা অনুযায়ী সত্য মনে করেই তিনি মোস্তালিক গোত্র সম্পর্কে একটি বাস্তবে ভ্রান্ত সংবাদ দিয়েছিলেন। তাই আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ অনায়াসেই তা হতে পারে, যা উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এই আয়াত ফাসিকের খবর অগ্রহণীয় হওয়া সম্পর্কে একটি সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করেছে এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষাপটে এই আয়াত অবতরণের ফলে বিষয়টি এভাবে আরও জোরদার হয়েছে যে, ওলীদ ইবনে ওকবা (রা) ফাসিক না হলেও তাঁর খবর শক্তিশালী ইঙ্গিত দ্বারা অগ্রহণীয় মনে হয়েছে। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা) কেবল তাঁর খবরের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে তদন্তের আদেশ দেন। সুতরাং একজন সৎ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির খবরে ইঙ্গিতের ভিত্তিতে সন্দেহ হওয়ার কারণে যখন তদন্ত না করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল না, তখন ফাসিকের খবর কবুল না করা এবং তদনুযায়ী

ব্যবস্থা গ্রহণ না করা আরও সুস্পষ্ট। সাহাবীগণের 'আদালত' সম্পর্কিত আলোচনার কিছু অংশ পরবর্তী وان طائفتان من المؤمنين আয়াতেও বর্ণিত হবে।

وَاعْلَمُوٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۭ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۝ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ نِعْمَةً ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

(৭) তোমরা জেনে রাখ তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রসূল রয়েছেন। তিনি যদি অনেক বিষয়ে তোমাদের আবদার মেনে নেন, তবে তোমরাই কষ্ট পাবে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী। (৮) এটা আল্লাহ্‌র কৃপা ও নিয়ামত, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রসূল (বিদ্যমান) আছেন (যা আল্লাহ্‌র বড় নিয়ামত ; যেমন আল্লাহ্ বলেন : لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ الخ—এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা এই যে, কোন ব্যাপারে তোমরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে না যদিও তা পার্থিব ব্যাপার হয় এবং পার্থিব ব্যাপারাদিতে তিনি তোমাদের মতামত মেনে নেবেন, এরূপ চিন্তা করো না। কেননা) তিনি যদি অনেক বিষয়ে তোমাদের আবদার মেনে নেন, তবে তোমরাই কষ্ট পাবে। (কারণ, সেটা উপযোগিতার খেলাফ হলে তদনুযায়ী কাজ করার মধ্যে অবশ্যই ক্ষতি হবে। কিন্তু রসূলের মতামত অনুযায়ী কাজ করলে সেরূপ হবে না। কেননা, পার্থিব ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও সেটা উপযোগিতার খেলাফ হওয়ার সম্ভাবনা যদিও অবান্তর ও নবুওয়তের পরিপন্থী নয়, কিন্তু প্রথমত এরূপ সম্ভাবনা বিশিষ্ট ব্যাপার খুবই কম হবে। হলে যদিও তাতে উপযোগিতা নষ্টও হয়ে যায়, তবে এই উপযোগিতার বিকল্প অর্থাৎ পুরস্কার ও রসূলের আনুগত্যের সওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিন্তু তোমাদের মতামত অনুযায়ী কাজ করলে খুব নগণ্য সংখ্যক ব্যাপার এমন হবে, যাতে উপযোগিতা তোমাদের মতামতের অনুকূলে থাকবে ; কিন্তু তা নির্দিষ্ট না হওয়ার কারণে ক্ষতির আশংকাই বেশী থাকবে এবং এর কোন ক্ষতিপূরণ নেই। এই ব্যাখ্যা দ্বারা 'অনেক বিষয়ে' কথাটির উপকারিতাও জানা গেল। মোটকথা, আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদের মতানুযায়ী কাজ করলে তোমরাই বিপদগ্রস্ত হতে) কিন্তু আল্লাহ (তোমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন এভাবে

যে) তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করেছেন এবং তা (অর্জনকে) হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন এবং কুফর, পাপাচার (অর্থাৎ কবিরা গোনাহ্) ও (যে কোন) নাফরমানীর (অর্থাৎ সগীরা গোনাহ্র) প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (ফলে তোমরা সর্বদা রসূলের সন্তুষ্টি অন্বেষণ কর এবং রসূলের সন্তুষ্টি বিধানকারী নির্দেশাবলী মেনে চল। সেমতে তোমরা যখন জানতে পেরেছ যে, সাংসারিক বিষয়াদিতেও রসূলের আনুগত্য ওয়াজিব এবং পূর্ণ আনুগত্য ব্যতীত ঈমান পূর্ণ হয় না, তখন তোমরা অনতিবিলম্বে এই নির্দেশও কবূল করে নিয়েছ এবং কবূল করে ঈমানকে আরও পূর্ণ করে নিয়েছ)। তারাই আল্লাহ্ তা'আলার কৃপা ও অনুগ্রহে সৎ পথ অবলম্বনকারী। আল্লাহ্ (এসব নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, তিনি এসবের উপকারিতা সম্পর্কে) সবিশেষ জ্ঞাত এবং (যেহেতু তিনি) প্রজ্ঞাময়, (তাই এসব নির্দেশ ওয়াজিব করে দিয়েছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর আগের আয়াতে ওলীদ ইবনে ওকবা ও মুস্তালিক গোত্রের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছিল। ওলীদ ইবনে ওকবা মুস্তালিক গোত্র সম্পর্কে খবর দিয়েছিল যে, তারা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছে এবং যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। এতে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও উত্তেজনা দেখা দেয়। তাঁদের মত ছিল যে, মুস্তালিক গোত্রের বিপক্ষে যুদ্ধাভিযান করা হোক। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) ওলীদ ইবনে ওকবার খবরকে শক্তিশালী ইঙ্গিতের খেলাফ মনে করে কবূল করেন নি এবং তদন্তের জন্য খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে আদেশ করেন। আগের আয়াতে কোরআন এ বিষয়কে আইনের রূপ দান করেছে যে, যে ব্যক্তির খবরে শক্তিশালী ইঙ্গিতের মাধ্যমে সন্দেহ দেখা দেয়, তদন্তের পূর্বে তার খবর অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা বৈধ নয়। আলোচ্য আয়াতে সাহাবায়ে কিরামকে আরও একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদিও বনূ মুস্তালিক সম্পর্কিত খবর শুনে তোমাদের উত্তেজনা ধর্মীয় মর্যাদাবোধের কারণে ছিল ; কিন্তু তোমাদের মতামত নির্ভুল ছিল না। রসূলের অবলম্বিত পন্থাই উত্তম ছিল।---(মাযহারী) উদ্দেশ্য এই যে, পরামর্শ সাপেক্ষ ব্যাপারাদিতে কোন মত পেশ করা তো দুরস্ত ; কিন্তু এরূপ চেষ্টা করা যে, রসূল (সা) এই মত অনুযায়ীই কাজ করুন, এটা দুরস্ত নয়। কেননা, সাংসারিক ব্যাপারাদিতে যদিও খুব কমই রসূলের মতামত উপযোগিতার বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যা নবুয়তের পরিপন্থী নয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে যে দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন, তা তোমাদের নেই। তাই রসূল যদি তোমাদের মতামত মেনে চলেন, তবে অনেক ব্যাপারে তোমাদের কষ্ট ও বিপদ হবে। যদি কুত্রাপি কোথাও তোমাদের মতামতের মধ্যেই উপযোগিতা নিহিত থাকে এবং তোমরা রসূলের আনুগত্যের খাতিরে নিজেদের মতামত পরিত্যাগ কর, যাতে তোমাদের সাংসারিক ক্ষতিও হয়ে যায়, তবে তাতে ততটুকু ক্ষতি নেই, যতটুকু তোমাদের মতামত মেনে চলার মধ্যে আছে। কেননা, এমতাবস্থায় কিছু সাংসারিক ক্ষতি হয়ে গেলেও রসূলের আনুগত্যের পুরস্কার ও সওয়াব এর চমৎকার বিকল্প বিদ্যমান আছে। عَنِتُّمْ শব্দটি

عنت থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ গোনাহ্ও হয় এবং কোন বিপদে পতিত হওয়াও হয়। এখানে উভয় অর্থের সম্ভাবনা আছে।---(কুরতুবী)

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ
إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا
بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

(৯) যদি মু'মিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দেবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। (১০) মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহ্কে ভয় করবে---যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যদি মু'মিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও (অর্থাৎ যুদ্ধের মূল কারণ দূর করে যুদ্ধ বন্ধ করিয়ে দাও)। অতঃপর যদি (মীমাংসার চেষ্টার পরও) তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, (এবং যুদ্ধ-বিরতি কার্যকর না করে) তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে (আল্লাহ্র নির্দেশ বলে যুদ্ধ-বিরতি বোঝানো হয়েছে)। এরপর যদি আক্রমণকারী দল (আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে) ফিরে আসে (অর্থাৎ যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়), তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দাও (অর্থাৎ শরীয়তের বিধানা-নুযায়ী ব্যাপারটি মীমাংসা করে দাও। শুধু যুদ্ধ বন্ধ করেই ক্ষান্ত হয়ো না। মীমাংসা না হলে পুনরায় যুদ্ধ বাধাবার আশংকা থাকবে)। এবং ইনসাফ কর। (অর্থাৎ কোন মানসিক স্বার্থকে প্রবল হতে দিয়ো না)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। (পারস্পরিক মীমাংসার আদেশ দেওয়ার কারণ এই যে) মু'মিনরা তো (ধর্মীয় অভিন্নতা তথা আধ্যাত্মিক সম্পর্কের কারণে একে অপরের) ভাই। অতএব তোমাদের দুই ভাইয়ের

মধ্যে মীমাংসা করে দাও (যাতে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে)। এবং (মীমাংসার সময়) আল্লাহ্‌কে ভয় কর (অর্থাৎ শরীয়তের মীমাংসার প্রতি লক্ষ্য রাখ), যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হক, আদব এবং তাঁর পক্ষে কষ্টদায়ক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকার কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত-সমূহে সাধারণ দলগত ও ব্যক্তিগত রীতিনীতি এবং পারস্পরিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে। অপরকে কষ্ট প্রদান থেকে বিরত থাকাই আলোচ্য আয়াতগুলোর মূল প্রতিপাদ্য।

শানে-নুযূল ঃ এসব আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে তফসীরবিদগণ একাধিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনায় খোদ মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়বস্তু আছে। এখন সকল ঘটনার সমষ্টি আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ হতে পারে অথবা কোন একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্য ঘটনাগুলোকে অনুরূপ দেখে সেগুলোকেও অবতরণের কারণের মধ্যে শরীক করে দেওয়া হয়েছে। এই আয়াতে আসলে যুদ্ধ ও জিহাদের সরঞ্জাম ও উপকরণের অধিকারী রাজন্যবর্গকে সম্বোধন করা হয়েছে। ---(বাহর ; রূহুল মা'আনী) পরোক্ষভাবে সকল মুসলমানকেও সম্বোধন করা হয়েছে যে, তারা এ ব্যাপারে রাজন্যবর্গের সাথে সহযোগিতা করবে। যেখানে কোন ইমাম, আমির, সরদার অথবা বাদশাহ্ নেই, সেখানে যতদূর সম্ভব বিবদমান উভয় পক্ষকে উপদেশ দিয়ে যুদ্ধ-বিরতিতে সম্মত করতে হবে। যদি উভয়ই সম্মত না হয়, তবে তাদের থেকে পৃথক থাকতে হবে। কারও বিরোধিতা এবং কারও পক্ষ অবলম্বন করা যাবে না। ---(বয়ানুল কোরআন)

মাসায়েল ঃ মুসলমানদের দুই দলের যুদ্ধ কয়েক প্রকার হতে পারে। এক. বিবদমান উভয় দল ইমামের শাসনাধীন হবে কিংবা উভয় দল শাসনাধীন হবে না কিংবা এক দল শাসনাধীন হবে কিংবা উভয় দল শাসনাধীন হবে এবং অন্যদল শাসন বহির্ভূত হবে। প্রথমোক্ত অবস্থায় সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে উপদেশের মাধ্যমে উভয় দলকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা। যদি উপদেশে বিরত না হয়, তবে ইমামের পক্ষ থেকে মীমাংসা করা ওয়াজিব। যদি ইসলামী সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে উভয় পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করে, তবে কিসাস ও রক্ত বিনিময়ের বিধান প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় উভয় পক্ষের সাথে বিদ্রোহীর ন্যায় ব্যবহার করা হবে। এক পক্ষ যুদ্ধ থেকে বিরত হলে এবং অপর পক্ষ জুলুম ও নির্যাতন অব্যাহত রাখলে দ্বিতীয় পক্ষকে বিদ্রোহী মনে করা হবে এবং প্রথম পক্ষকে আদিল বলা হবে। বিদ্রোহীদের প্রতি প্রযোজ্য বিস্তারিত বিধান ফিক্‌হ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সংক্ষেপে বিধান এই যে, যুদ্ধের আগে তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং তাদেরকে গ্রেফতার করে তওবা না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা হবে। যুদ্ধরত অবস্থায় কিংবা যুদ্ধের পর তাদের সন্তান-সন্ততিকে গোলাম অথবা বাঁদী করা হবে না এবং তাদের ধনসম্পদ যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ বলে গণ্য হবে না। তবে তওবা না করা পর্যন্ত ধনসম্পদ আটক রাখা হবে। তওবার পর প্রত্যর্পণ করা

হবে। আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ

وَأَقْسِطُوا অর্থাৎ যদি বিদ্রোহী দল বিদ্রোহ ও যুদ্ধ থেকে বিরত হয়, তবে শুধু যুদ্ধ-বিরতিই যথেষ্ট হবে না ; বরং যুদ্ধের কারণ ও পারস্পরিক অভিযোগ দূর করার চেষ্টা কর, যাতে কোন পক্ষের মনে বিদ্বেষ ও শত্রুতা অবশিষ্ট না থাকে এবং স্থায়ী ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তারা যেহেতু ইমামের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছে, তাই তাদের ব্যাপারে পুরোপুরি ইনসাফ না হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই কোরআন পাক উভয় পক্ষের অধিকারের ব্যাপারে ইনসাফের তাকীদ করেছে।—(বয়ানুল কোরআন)

মাস'আলা ঃ যদি মুসলমানদের কোন শক্তিশালী দল ইমামের বশ্যতা অস্বীকার করে, তবে ইমামের কর্তব্য হবে সর্বপ্রথম তাদের অভিযোগ শ্রবণ করা, তাদের কোন সন্দেহ কিংবা ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা দূর করা। তারা যদি তাদের বিরোধিতার শরীয়তসম্মত বৈধ কারণ উপস্থিত করে, যদ্দ্বারা খোদ ইমামের অন্যায়-অত্যাচার ও নিপীড়ন প্রমাণিত হয়, তবে সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে এই দলের সাহায্য ও সমর্থন করা, যাতে ইমাম জুলুম থেকে বিরত হয়। এক্ষেত্রে ইমামের জুলুম নিশ্চিত ও সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হওয়া শর্ত।—(মাযহারী)

পক্ষান্তরে যদি তারা তাদের বিদ্রোহ ও আনুগত্য বর্জনের পক্ষে কোন সুস্পষ্ট ও সঙ্গত কারণ পেশ করতে না পারে এবং ইমামের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানদের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া হালাল। ইমাম শাফেয়ী বলেন, তারা যুদ্ধ শুরু না করা পর্যন্ত মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু করা জায়েয হবে না।—(মাযহারী)

এই বিধান তখন, যখন এই দেশের বিদ্রোহী ও অত্যাচারী হওয়া নিশ্চিতরূপে জানা যায়। যদি উভয় পক্ষ কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণ রাখে এবং কে বিদ্রোহী ও কে আদিল, তা নির্দিষ্ট করা কঠিন হয়, তবে প্রত্যেক মুসলমানই নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী যে পক্ষকে আদিল মনে করবে সেই পক্ষকে সাহায্য ও সমর্থন করতে পারে। যার এরূপ কোন প্রবল ধারণা নেই, সে নিরপেক্ষ থাকবে, যেমন জমল ও সিফফীন যুদ্ধে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ ঃ ইমাম আবূ বকর ইবনে আরাবী (রা) বলেন ঃ এই আয়াত মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের যাবতীয় প্রকারের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে। সেসব দ্বন্দ্ব-কলহও এই আয়াতের মধ্যে দাখিল, যাতে উভয় পক্ষ কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণের ভিত্তিতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। সাহাবায়ে কিরামের বাদানুবাদ এই প্রকারের মধ্যে পড়ে। কুরতুবী ইবনে আরাবীর এই উক্তি উদ্ধৃত করে এ স্থলে সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ তথা জঙ্গে-জমল ও সিফফীনের আসল স্বরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে পরবর্তী যুগের মুসলমানদের কর্মপন্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এখানে কুরতুবীর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

কোন সাহাবীকে অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে ভ্রান্ত বলা জায়েয নয়। কারণ, তাঁরা সবাই ইজতিহাদের মাধ্যমেই নিজ নিজ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছিলেন। সবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ। তাঁরা সবাই আমাদের নেতা। আমাদের প্রতি নির্দেশ এই যে, আমরা যেন তাঁদের পারস্পরিক বিরোধ সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকি এবং সর্বদা উত্তম পন্থায় তাঁদের ব্যাপারে আলোচনা করি। কেননা, সাহাবী হওয়া বড়ই সম্মানের বিষয়। নবী করীম (সা) তাঁদেরকে মন্দ বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। এছাড়া বিভিন্ন সনদে এই হাদীস প্রমাণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত তালহা (রা) সম্পর্কে বলেছেন : ان طلحة شهيد يمشى على وجه الارض অর্থাৎ তালহা ভূপৃষ্ঠে চলাফেরাকারী শহীদ।

এখন হযরত আলী (রা)-র বিরুদ্ধে হযরত তালহা (রা)-র যুদ্ধের জন্য বের হওয়া প্রকাশ্য গোনাহ্ ও নাফরমানী হলে এ যুদ্ধে শহীদ হয়ে তিনি কিছুতেই শাহাদতের মর্যাদা লাভ করতে পারতেন না। এমনিভাবে হযরত তালহার এই কাজকে ভ্রান্ত এবং কর্তব্য পালনে ত্রুটি সাব্যস্ত করা সম্ভব হলেও তাঁর জন্য শাহাদতের মর্তবা অর্জিত হত না। কারণ, শাহাদত একমাত্র তখনই অর্জিত হয়, যখন কেউ আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে প্রাণ বিসর্জন দেয়। কাজেই তাঁদের ব্যাপারে পূর্ববর্ণিত বিশ্বাস পোষণ করাই জরুরী।

এ ব্যাপারে খোদ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত সহীহ্ ও মশহুর হাদীস দ্বিতীয় প্রমাণ। তাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যুবায়রের হত্যাকারী জাহান্নামে আছে।

হযরত আলী (রা) বলেন : আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একথা বলতে শুনেছি, সফিয়্যা-তনয়ের হত্যাকারীকে জাহান্নামের খবর দিয়ে দাও। অতএব, প্রমাণিত হল যে, হযরত তালহা (রা) ও হযরত যুবায়র (রা) এই যুদ্ধের কারণে পাপী ও গোনাহ্গার ছিলেন না। এরূপ হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত তালহাকে শহীদ বলতেন না এবং যুবায়রের হত্যাকারী সম্পর্কে জাহান্নামের ভবিষ্যদ্বাণী করতেন না। এছাড়া তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্যতম। তাঁদের জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য প্রায় সর্ববাদিসম্মত।

এমনিভাবে সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা এসব যুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিলেন, তাঁদেরকেও ভ্রান্ত বলা যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে ইজতিহাদের মাধ্যমে এ মতের উপরই কায়েম রেখেছেন—এদিক দিয়ে তাঁদের কর্মপন্থাও সঠিক ছিল। সুতরাং এ কারণে তাঁদেরকে ভর্ৎসনা করা, তাঁদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তাঁদেরকে ফাসিক সাব্যস্ত করা এবং তাঁদের ফযিলত, সাধনা ও মহান ধর্মীয় মর্যাদা অস্বীকার করা কিছুতেই দুরস্ত নয়। জনৈক আলিমকে জিজ্ঞাসা করা হয় : সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক বাদানুবাদের ফলস্বরূপ যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি জওয়াবে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُونَ

عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

অর্থাৎ সেই উম্মত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাদের কাজকর্ম তাদের জন্য এবং তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্য। তারা কি করত না করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

একই প্রশ্নের জওয়াবে অন্য একজন বুযুর্গ বলেন ঃ এটা এমন রক্ত যে, আল্লাহ্ এর দ্বারা আমার হাতকে রঞ্জিত করেন নি। এখন আমি আমার জিহ্বাকে এর সাথে জড়িত করতে চাই না। উদ্দেশ্য এই যে, আমি কোন এক পক্ষকে কোন ব্যাপারে নিশ্চিত ভ্রান্ত সাব্যস্ত করার ভুলে লিপ্ত হতে চাই না।

আল্লামা ইবনে ফওর বলেন ঃ আমাদের একজন সহযোগী বলেছেন যে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যবর্তী বাদানুবাদ ইউসুফ (আ) ও তাঁর ভ্রাতাদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলীর অনুরূপ। তাঁরা পারস্পরিক বিরোধ সত্ত্বেও বেলায়েত ও নবুয়তের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে যান নি। সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক ঘটনাবলীর ব্যাপারটিও হুবহু তাই।

হযরত মুহাসেবী (র) বলেন ঃ সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক রক্তপাতের ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে কিছু মন্তব্য করা সুকঠিন। কেননা, এ ব্যাপারে খোদ সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ ছিল। হযরত হাসান বসরী (র) সাহাবীদের পারস্পরিক যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন ঃ এসব যুদ্ধে সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আমরা অনুপস্থিত। তাঁরা সম্পূর্ণ অবস্থা জানতেন। আমরা জানি না। যে ব্যাপারে সব সাহাবী একমত আমরা তাতে তাঁদের অনুসরণ করব এবং যে ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ আছে, সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চুপ থাকব।

হযরত মুহাসেবী (র) বলেন ঃ আমিও তাই বলি, যা হযরত হাসান বসরী (র) বলেছেন। আমি জানি তাঁরা যে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন, সে ব্যাপারে তাঁরা আমাদের চাইতে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাই তাঁদের সর্বসম্মত বিষয়ে তাঁদের অনুসরণ করা এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকাই আমাদের কাজ। আমাদের তরফ থেকে নতুন কোন পথ আবিষ্কার করা অনুচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁরা সবাই ইজতিহাদের মাধ্যমে কাজ করেছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করেছিলেন। তাই ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁরা সবাই সন্দেহ ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا

خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ

بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَ مَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١١﴾

(১১) হে মু'মিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গোনাহ্। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে, তারাই জালিম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, পুরুষরা যেন অপর পুরুষদেরকে উপহাস না করে। কেননা, (যাদেরকে উপহাস করা হয়) তারা তাদের (অর্থাৎ উপহাসকারীদের) অপেক্ষা (আল্লাহ্র কাছে) উত্তম হতে পারে এবং নারীরাও যেন অপর নারীদেরকে উপহাস না করে। কেননা, (যাদেরকে উপহাস করা হয়) তারা তাদের (অর্থাৎ উপহাসকারিণীদের) অপেক্ষা (আল্লাহ্র কাছে) শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না (কেননা, এগুলো গোনাহ্)। বিশ্বাস স্থাপন করার পর (মুসলমানের প্রতি) গোনাহ্র নাম আরোপিত হওয়া (-ই) মন্দ। (অর্থাৎ মুসলমানকে এ কথা বলা যে, সে আল্লাহ্র নাফরমানী করে যা ঘৃণার বিষয়। অতএব, এ থেকে বেঁচে থাক)। যারা (এহেন কাজ থেকে) বিরত না হয়, তারা জালিম (অর্থাৎ বান্দার হক নষ্টকারী। জালিমরা যে শাস্তি পাবে, তারাও তাই পাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হুজুরাতের শুরুতে নবী করীম (সা)-এর হক ও আদব, অতঃপর সাধারণ মুসলমানদের পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী দুই আয়াতে মসলমানদের দলগত সংশোধনের বিধান উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক হক, আদব ও সামাজিক রীতিনীতি বিবৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এক. কোন মুসলমানকে ঠাট্টা ও উপহাস করা ; দুই. কাউকে দোষারোপ করা, এবং তিন. কাউকে অপমান করা অথবা পীড়াদায়ক নামে ডাকা।

কুরতুবী বলেনঃ কোন ব্যক্তিকে হেয় ও অপমান করার জন্য তার কোন দোষ এমনভাবে উল্লেখ করা, যাতে শ্রোতারা হাসতে থাকে, তাকে تمسخر - سخرية ও استهزاء বলা হয়। এটা যেমন মুখে সম্পন্ন হয়, তেমনি হস্তপদ ইত্যাদি দ্বারা ব্যঙ্গ অথবা ইঙ্গিতের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে থাকে। কারও কথা শুনে অপমানের ভঙ্গিতে বিদ্রূপ করার মাধ্যমেও হতে পারে। কেউ কেউ বলেনঃ শ্রোতাদের হাসির উদ্রেক করে, এমনভাবে কারও সম্পর্কে আলোচনা করাকে تمسخر ও سخرية বলা হয়। কোরআনের বর্ণনা মতে এগুলো সব হারাম।

কোরআন পাক এত গুরুত্ব সহকারে سخرية তথা উপহাস নিষিদ্ধ করেছে যে, এক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী জাতিকে পৃথক পৃথকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। পুরুষদের জন্য 'কওম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, অভিধানে এ শব্দটি পুরুষদের জন্যই নির্ধারিত, যদিও রূপক ভঙ্গিতে নারীদেরকেও শামিল করা হয়ে থাকে। কোরআন পাক সাধারণত পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য 'কওম' শব্দ ব্যবহার করেছে। কিন্তু কোরআন এখানে 'কওম' শব্দটি বিশেষভাবে পুরুষদের জন্য ব্যবহার করেছে এবং এর বিপরীতে نساء শব্দের মাধ্যমে নারীদের কথা উল্লেখ করেছে। উভয়কে বলা হয়েছে যে, যে পুরুষ অপর পুরুষকে উপহাস করে, সে আল্লাহ্‌র কাছে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। এমনিভাবে যে নারী অপর নারীকে উপহাস করে, সে আল্লাহ্‌র কাছে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। কোরআনে পুরুষ পুরুষকে এবং নারী নারীকে উপহাস করা ও তা হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; অথচ কোন পুরুষ নারীকে এবং কোন নারী পুরুষকে উপহাস করলে তা-ও হারাম। কিন্তু একথা উল্লেখ না করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নারী ও পুরুষের মেলামেশাই শরীয়তে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়। মেলামেশা না হলে উপহাসের প্রশ্নই ওঠে না। আয়াতের সারমর্ম এই যে, কোন ব্যক্তির দেহে, আকার-আকৃতিতে অথবা গঠন-প্রকৃতিতে কোন দোষ দৃষ্টিগোচর হলে তা নিয়ে কারও হাসাহাসি অথবা উপহাস করা উচিত নয়। কেননা, তার জানা নেই যে, সম্ভবত এই ব্যক্তি সততা, আন্তরিকতা ইত্যাদির কারণে আল্লাহ্‌র কাছে তার চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। এই আয়াত পূর্ববর্তী বুযুর্গ ও মনীষীদের অন্তরে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমর ইবনে শোরাহ্‌বিল (রা) বলেন: কোন ব্যক্তিকে বকরীর স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধ পান করতে দেখে যদি আমার হাসির উদ্রেক হয়, তবে আমি আশংকা করতে থাকি যে, কোথাও আমিও এরূপই না হয়ে যাই। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন: কোন কুকুরকেও উপহাস করতে আমার ভয় লাগে যে, আমিও নাকি কুকুর হয়ে যাই।—(কুরতুবী)

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের আকার-আকৃতি ও ধনদৌলতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তাদের অন্তর ও কাজকর্ম দেখেন। কুরতুবী বলেন: এই হাদীস থেকে এই বিধি ও মূলনীতি জানা যায় যে, কোন ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাকে নিশ্চিতরূপে ভাল অথবা মন্দ বলে দেওয়া জায়েয নয়। কারণ, যে ব্যক্তির বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মকে আমরা খুব ভাল মনে করছি, সে আল্লাহ্‌র কাছে নিন্দনীয় হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্ তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও অন্তরগত গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা ও ক্রিয়াকর্ম মন্দ, তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও অন্তরগত গুণাগুণ তার কুকর্মের কাফফারা হয়ে যেতে পারে। তাই যে ব্যক্তিকে মন্দ অবস্থা ও কুকর্মে লিপ্ত দেখ, তার এই অবস্থাকে মন্দ মনে কর; কিন্তু তাকে হেয় ও লাঞ্ছিত মনে করার অনুমতি নেই। আয়াতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে لمز—এর অর্থ কারও দোষ বের করা, দোষ প্রকাশ করা এবং দোষের কারণে ভর্ৎসনা করা, ইরশাদ হয়েছে: لَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ —অর্থাৎ

তোমরা নিজেদের দোষ বের করো না। এই বাক্যটি لَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ-এর মতই, যার অর্থ তোমরা নিজেদের দোষ বের করার অর্থ এই যে, তোমরা পরস্পরে একে অন্যকে হত্যা করো না এবং একে অন্যের দোষ বের করো না। এরূপ ভঙ্গিতে ব্যক্ত করার রহস্য একথা বলা যে, অপরকে হত্যা করা এক দিক দিয়ে নিজেকেই হত্যা করার শামিল। কেননা, প্রায়ই তো এরূপ হয়েই যায় যে, একজন অন্যজনকে হত্যা করলে নিহত ব্যক্তির সমর্থকরা তাকেও হত্যা করে। এটা না হলেও প্রকৃত সত্য এই যে, মুসলমান সব ভাই ভাই। ভাইকে হত্যা করা যেন নিজেকে হত্যা করা এবং হস্তপদ বিহীন করে দেওয়া لَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ-এর অর্থ তাই। অর্থাৎ তোমরা অন্যের দোষ বের করলে, সে-ও তোমাদের দোষ বের করবে। কারণ, দোষ থেকে কোন মানুষ মুক্ত নয়। জনৈক আলিম বলেন ঃ وفيك عيوب وللناس اعين অর্থাৎ তোমার মধ্যেও দোষ আছে এবং মানুষের চক্ষু আছে। তারা দোষ দেখে। তুমি কারও দোষ বের করলে সে-ও তোমার দোষ বের করবে। যদি সে সবর করে, তবে সেই কথাই বলতে হবে যে, মুসলমান ভাইয়ের দুর্নাম নিজেরই দুর্নাম।

আলিমগণ বলেন ঃ নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি রেখে তা সংশোধনের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকার মধ্যেই মানুষের সৌভাগ্য নিহিত। যে এরূপ করে, সে অপরের দোষ বের করা ও বর্ণনা করার অবসরই পায় না। হিন্দুস্তানের সর্বশেষ মুসলমান বাদশাহ্ যুফর চমৎকার বলেছেন ঃ

نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر - رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر
پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر - تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا

আয়াতে নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে অপরকে মন্দ নামে ডাকা, যদ্দরুন সে অসন্তুষ্ট হয়। উদাহরণত কাউকে খঞ্জ, খোঁড়া অথবা অন্ধ বলে ডাকা অথবা অপমানজনক নামে সম্বোধন করা। হযরত আবূ জুবায়ের আনসারী (রা) বলেন ঃ এই আয়াত আমাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন আমাদের অধিকাংশ লোকের দুই তিনটি করে নাম খ্যাত ছিল। তন্মধ্যে কোন কোন নাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে লজ্জা দেওয়া ও লাঞ্ছিত করার জন্য লোকেরা খ্যাত করেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তা জানতেন না। তাই মাঝে মাঝে সেই মন্দ নাম ধরে তিনি সম্বোধন করতেন। তখন সাহাবায়ে কিরাম বলতেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, সে এই নাম শুনলে অসন্তুষ্ট হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ-এর অর্থ হচ্ছে কেউ কোন গোনাহ্ অথবা মন্দ কাজ করে তওবা করার পরও তাকে সেই মন্দ কাজের নামে

ডাকা। উদাহরণত চোর, ব্যভিচারী অথবা শরাবী বলে সম্বোধন করা। যে ব্যক্তি চুরি, যিনা, শরাব ইত্যাদি থেকে তওবা করে নেয়, তাকে অতীত কুকর্ম দ্বারা লজ্জা দেওয়া ও হেয় করা হারাম। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন গোনাহ্ দ্বারা লজ্জা দেয়, যা থেকে সে তওবা করেছে তাকে সেই গোনাহে লিপ্ত করে ইহকাল ও পরকালে লাঞ্ছিত করার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করেন।---(কুরতুবী)

কোন কোন নামের ব্যতিক্রম ঃ কোন কোন লোকের এমন নাম খ্যাত হয়ে যায়, যা আসলে মন্দ, কিন্তু এই নাম ব্যতীত কেউ তাকে চেনে না। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হেয় লাঞ্ছিত করার ইচ্ছা না থাকলে তাকে এই নামে ডাকা জায়েয। এ ব্যাপারে আলিমগণ একমত ; যেমন কোন কোন মুহাদ্দিসের নামের সাথে احدب—اعرج ইত্যাদি খ্যাত আছে। খোদ রসূলুল্লাহ্ (সা) জনৈক অপেক্ষাকৃত লম্বা হাতবিশিষ্ট সাহাবীকে ذو اليدين নামে পরিচিত করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ হাদীসের সনদে কতক নামের সাথে কিছু পদবী যুক্ত হয় ; যেমন مروان الاحضر - سليمان الاعمش - حميد الطويل ইত্যাদি এসব। পদবী সহকারে নাম উল্লেখ করা জায়েয কি না ? তিনি বললেন ঃ দোষ বর্ণনা করার ইচ্ছা না থাকলে এবং পরিচয় পূর্ণ করার ইচ্ছা থাকলে জায়েয।---(কুরতুবী)

ভাল নামে ডাকা সুন্নত ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মু'মিনের হক অপর মু'মিনের উপর এই যে, তাকে অধিক পছন্দনীয় নাম ও পদবী সহকারে ডাকবে। এ কারণেই আরবে ডাক নামের ব্যাপক প্রচলন ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তা পছন্দ করেছিলেন। তিনি বিশেষ বিশেষ সাহাবীকে কিছু পদবী দিয়েছিলেন---হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে 'আতীক,' হযরত ওমর (রা)-কে 'ফারুক,' হযরত হামযা (রা)-কে 'আসাদুল্লাহ্' এবং খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে 'সাইফুল্লাহ্' পদবী দান করেছিলেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝

(১২) হে মু'মিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ্। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত

তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ্। (তাই ধারণার যত প্রকার আছে, সবগুলোর বিধান জেনে নাও যে, কোন্ ধারণা জায়েয এবং কোন্‌টি নাজায়েয। এরপর জায়েয ধারণার মধ্যেই থাক)। এবং (কারও দোষের) সন্ধান করো না। কেউ যেন কারও গীবত তথা পশ্চাতে নিন্দাও না করে। (এরপর গীবতের নিন্দা করে বলা হয়েছে) তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে, সে তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করবে? একে তো তোমরা (অবশ্যই) খারাপ মনে কর (অতএব বুঝে নাও যে, কোন ভ্রাতার গীবতও এরই মত)। আল্লাহ্‌কে ভয় কর (গীবত পরিত্যাগ করে তওবা করে নাও)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই আয়াতেও পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি ব্যক্ত হয়েছে এবং এতেও তিনটি বিষয় হারাম করা হয়েছে। এক. ظن তথা ধারণা; দুই. تجسس অর্থাৎ কোন গোপন দোষ সন্ধান করা; এবং তিন. গীবত অর্থাৎ কোন অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে শুনলেও অসহনীয় মনে করত। প্রথম বিষয় ظن এর অর্থ প্রবল ধারণা। এ সম্পর্কে কোরআন প্রথমত বলেছে যে, অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক; এরপর কারণ-স্বরূপ বলা হয়েছে, কতক ধারণা পাপ। এ থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক ধারণাই পাপ নয়। অতএব কোন্ ধারণা পাপ, তা জেনে নেওয়া ওয়াজিব হবে, যাতে তা থেকে আত্মরক্ষা করা যায় এবং জায়েয না জানা পর্যন্ত তার কাছেও না যায়। আলিম ও ফিকহ্‌বিদগণ এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কুরতুবী বলেন: ধারণা বলে এ স্থলে অপবাদ বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে শক্তিশালী প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন দোষ অথবা গোনাহ্ আরোপ করা। ইমাম আবূ বকর জাসসাস 'আহকামুল কোরআন' গ্রন্থে এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ধারণা চার প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার হারাম, দ্বিতীয় প্রকার ওয়াজিব, তৃতীয় প্রকার মুস্তাহাব এবং চতুর্থ প্রকার জায়েয। হারাম ধারণা এই যে, আল্লাহ্‌র প্রতি কুধারণা রাখা যে, তিনি আমাকে শাস্তিই দেবেন অথবা বিপদেই রাখবেন। এটা যেন আল্লাহ্‌র মাগফিরাত ও রহমত থেকে নৈরাশ্য। হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন:

لا يموتن احدكم الا و هو يحسن الظن بالله তোমাদের কারও আল্লাহ্‌র প্রতি সুধারণা পোষণ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করা উচিত নয়। অন্য এক হাদীসে আছে انا عند ظن عبدى بى. —অর্থাৎ আমি আমার বান্দার সাথে তেমনি ব্যবহার করি, যেমন সে আমার সম্বন্ধে ধারণা রাখে। এখন তার আমার প্রতি যা ইচ্ছা ধারণা রাখুক। এ থেকে

জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা ফরয এবং কুধারণা পোষণ করা হারাম। এমনিভাবে যেসব মুসলমান বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে সৎকর্মপরায়ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের সম্পর্কে প্রমাণ ব্যতিরেকে কুধারণা পোষণ করা হারাম। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : ايا كم والظن فان الظن اكذب الحديث —অর্থাৎ ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, ধারণা মিথ্যা কথার নামান্তর। এখানে সবার মতেই ধারণা বলে প্রমাণ ব্যতিরেকে মুসলমানের প্রতি কুধারণা বোঝানো হয়েছে। যেসব কাজের কোন এক দিককে আমলে আনা আইনত জরুরী এবং সে সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই ; সেখানে প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব ; যেমন পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ ও মোকদ্দমার ফয়সালায় নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়া। কারণ, যে বিচারকের আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়, তার জন্য ফয়সালা দেওয়া জরুরী ও ওয়াজিব এবং এই বিশেষ ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসে কোন বর্ণনা নেই। এমতাবস্থায় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করা বিচারকের জন্য জরুরী। এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরও মিথ্যা বলার সম্ভাবনা থাকে। তার সত্যবাদিতা নিছক একটা প্রবল ধারণা মাত্র। সেমতে এই ধারণা অনুযায়ী আমল করাই ওয়াজিব। এমনিভাবে যে জায়গায় কিবলার দিক অজ্ঞাত থাকে এবং জেনে নেওয়ার মত কোন লোকও না থাকে, সেখানে নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। কোন ব্যক্তির উপর কোন বস্তুর ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব হলে সেই বস্তুর মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারেও প্রবল ধারণা অনুযায়ীই আমল করা ওয়াজিব। জায়েয ধারণা এমন, যেমন নামাযের রাক'আত সম্পর্কে সন্দেহ হল যে, তিন রাক'আত পড়া হয়েছে, না চার রাক'আত। এমতাবস্থায় প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা জায়েয। যদি সে প্রবল ধারণা বাদ দিয়ে নিশ্চিত বিষয় অর্থাৎ তিন রাক'আত সাব্যস্ত করে চতুর্থ রাক'আত পড়ে নেয়, তবে তাও জায়েয। প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করা মুস্তাহাব। এর জন্য সওয়াবও পাওয়া যায়।—(জাসসাস)

কুরতুবী বলেন : কোরআনে বলা হয়েছে :

لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا —এতে মু'মিনদের প্রতি সুধারণা পোষণ করার তাকীদ আছে। অপর পক্ষে একটি সুবিদিত বাক্য আছে ان من الحزم سوء الظن —অর্থাৎ প্রত্যেকের প্রতি কুধারণা পোষণ করাই সাবধানতা। এর উদ্দেশ্য এই যে, কুধারণার বশবর্তী হয়ে যেরূপ ব্যবহার করা হয়, প্রত্যেকের সাথে সেইরূপ ব্যবহার করবে। অর্থাৎ আস্থা ব্যতিরেকে নিজের জিনিস কাউকে সোপর্দ করবে না। এর অর্থ এরূপ নয় যে, অপরকে চোর মনে করে লাঞ্ছিত করবে। মোটকথা, কোন ব্যক্তিকে চোর অথবা বিশ্বাসঘাতক মনে না করে নিজের ব্যাপারে সতর্ক হবে। শেখ সাদী (র)-র নিম্নোক্ত উক্তির অর্থই তাই।

نگه دار وآں شوخ در کیسه در - که دا ند همه خلق را کیسه بر

আয়াতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে تجسس ; অর্থাৎ কারও দোষ সন্ধান করা। এই শব্দে দুটি কিরাআত আছে। এক. لا تجسسوا—জীম সহকারে ; এবং দুই لا تحسسوا হ্যাঁ সহকারে। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে এই দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে لا تجسسوا و لا تحسسوا উভয় শব্দের অর্থ কাছাকাছি। আখফাশ উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, জীম সহকারে تجسس এর অর্থ কোন গোপন বিষয় সন্ধান করা এবং হ্যাঁ সহকারে تحسس এর অর্থ সাধারণ সন্ধান করা। সূরা ইউসুফে تَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ আয়াতে এই অর্থই ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে দোষ তোমার সামনে আছে, তা ধরতে পার, কিন্তু কোন মুসলমানের যে দোষ প্রকাশ্য নয়, তা সন্ধান করা জায়েয নয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لا تغتابوا المسلمين و لا تتبعوا عوراتهم فان من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته و من يتبع الله عورته يفضحه فى بيته -

মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না। কেননা, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ্ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আল্লাহ্ যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে স্বগৃহেও লাঞ্ছিত করে দেন। —(কুরতুবী)

বয়ানুল কোরআনে আছে গোপনে অথবা নিদ্রার ভান করে কারও কথাবার্তা শোনাও নিষিদ্ধ, تجسس-এর অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে কিংবা নিজের অথবা অন্য মুসলমানের হিফাযতের উদ্দেশ্য থাকে, তবে ক্ষতিকারীর গোপন ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি অনুসন্ধান জায়েয। আয়াতে নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে গীবত। অর্থাৎ কারও অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কষ্টকর কথাবার্তা বলা, যদিও তা সত্য কথা হয়। কেননা, মিথ্যা হলে সেটা অপবাদ, যা কোরআনের অন্য আয়াত দ্বারা হারাম। এখানে 'অনুপস্থিতিতে' কথা থেকে এরূপ বোঝা সঙ্গত নয় যে, উপস্থিতিতে কষ্টকর কথা বলা জায়েয হবে। কেননা, এটা গীবত নয়, কিন্তু لمز তথা দোষ বের করার অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী আয়াতে এর নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে।

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا—এই আয়াত কোন মুসলমানের বেইজ্জতী ও অপমানকে তার মাংস খাওয়ার সমতুল্য সাব্যস্ত করেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সামনে উপস্থিত থাকলে এই বেইজ্জতী জীবিত মানুষের মাংস টেনে টেনে ভক্ষণ করার সমতুল্য হবে। لمز শব্দের মাধ্যমে কোরআন একে হারাম সাব্যস্ত করেছে ; যেমন বলা হয়েছে, لَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ এবং আরও পরে এক আয়াত আসবে وَيْلٌ لِكُلِّ

هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ—সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সামনে উপস্থিত না থাকলে তার পশ্চাতে কষ্টদায়ক কথা-বার্তা বলা মৃত মানুষের মাংস ভক্ষণের সমতুল্য। মৃত মানুষের মাংস ভক্ষণ করলে যেমন তার কোন কষ্ট হয় না, তেমনি অনুপস্থিত ব্যক্তি যে পর্যন্ত গীবতের কথা না জানে, তারও কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু কোন মৃত মুসলমানের মাংস খাওয়া যেমন হারাম ও চূড়ান্ত নীচতা, তেমনি গীবত করাও হারাম এবং নীচতা। কারণ, অসাক্ষাতে কাউকে মন্দ বলা কোন বীরত্বের কাজ নয়।

এই আয়াতে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করতে গিয়ে গীবতের নিষিদ্ধতাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং একে মৃত মুসলমানের মাংস ভক্ষণের সমতুল্য প্রকাশ করে এর নিষিদ্ধতা ও নীচতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর রহস্য এই যে, কারও উপস্থিতিতে তার দোষ প্রকাশ করা পীড়াদানের কারণে হারাম, কিন্তু তার প্রতিরোধ সে নিজেও করতে পারে। প্রতিরোধের আশংকায় প্রত্যেকেরই এরূপ দোষ প্রকাশ করার সাহসও হয় না এবং এটা স্বভাবতই বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। পক্ষান্তরে গীবতের মধ্যে কোন প্রতিরোধকারী থাকে না। নীচ থেকে নীচতর ব্যক্তি কোন উচ্চতর ব্যক্তির গীবত অনায়াসে করতে পারে। প্রতিরোধ না থাকার কারণে এর ধারা সাধারণত দীর্ঘ হয়ে থাকে এবং এতে মানুষ লিপ্তও হয় বেশী। এসব কারণে গীবতের নিষিদ্ধতার উপর অধিক জোর দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য করা হয়েছে যে, কেউ গীবত শুনলে তার অনুপস্থিত ভাইয়ের পক্ষ থেকে সাধ্যানুযায়ী প্রতিরোধ করবে। প্রতিরোধের শক্তি না থাকলে কমপক্ষে তা শ্রবণ থেকে বিরত থাকবে। কেননা, ইচ্ছাকৃতভাবে গীবত শোনাও নিজে গীবত করার মতই।

হযরত মায়মূন (রা) বলেন ঃ একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, জনৈক সঙ্গী ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে আছে এবং এক ব্যক্তি আমাকে বলছে--একে ভক্ষণ কর। আমি বললাম ঃ আমি একে কেন ভক্ষণ করব? সে বলল ঃ কারণ, তুমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গী গোলামের গীবত করেছ। আমি বললাম ঃ আল্লাহ্র কসম, আমি তো তার সম্পর্কে কখনও কোন ভালমন্দ কথা বলিনি। সে বলল ঃ হ্যাঁ, একথা ঠিক, কিন্তু তুমি তার গীবত শুনেছ এবং এতে সম্মত রয়েছ। এই ঘটনার পর হযরত মায়মূন (রা) নিজে কখনও কারও গীবত করেন নি এবং তাঁর মজলিসে কারও গীবত করতে দেন নি।

হযরত হাসান ইবনে মালেক (রা) বর্ণিত শবে মি'রাজের হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমাকে নিয়ে যাওয়া হলে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম যাদের নখ ছিল তামার। তারা তাদের মুখমণ্ডল ও দেহের মাংস আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম—এরা কারা? তিনি বললেন ঃ এরা তাদের ভাইয়ের গীবত করত এবং তাদের ইজ্জতহানি করত।—(মাযহারী)

হযরত আবূ সায়ীদ (রা) ও জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, الغيبة اشد من الزنا অর্থাৎ গীবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক গোনাহ্। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, এটা কিরূপে? তিনি বললেন, এক ব্যক্তি ব্যভিচার করার

পর তওবা করলে তার গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়, কিন্তু যে গীবত করে, তার গোনাহ্ প্রতিপক্ষের মাফ না করা পর্যন্ত মাফ হয় না।—(মাযহারী)

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, গীবতের মাধ্যমে আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক উভয়ই নষ্ট করা হয়। তাই যার গীবত করা হয়, তার কাছ থেকে মাফ নেওয়া জরুরী। কোন কোন আলিম বলেন ঃ যার গীবত করা হয়, গীবতের সংবাদ তার কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত বান্দার হক হয় না। তাই তার কাছ থেকে ক্ষমা নেওয়া জরুরী নয়। —(রূহুল মা'আনী) কিন্তু বয়ানুল কোরআনে একথা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে ঃ এমতাবস্থায় যদিও তার কাছে ক্ষমা চাওয়া জরুরী নয়, কিন্তু যার সামনে গীবত করা হয়, তার সামনে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলা এবং নিজ গোনাহ্ স্বীকার করা জরুরী। যদি সেই ব্যক্তি মারা যায়, কিংবা লাপাত্তা হয়ে যায়, তবে তার কাফ্ফারা এই যে, যার গীবত করা হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ্র কাছে মাগফিরাতের দোয়া করবে এবং এরূপ বলবে ঃ হে আল্লাহ্! আমার ও তার গোনাহ্ মাফ কর। হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাই বলেছেন।

মাস'আলা ঃ শিশু, উন্মাদ এবং কাফির যিম্মীর গীবতও হারাম। কেননা, তাদেরকে পীড়া দেওয়াও হারাম। হরবী কাফিরকে পীড়া দেওয়া হারাম না হলেও নিজের সময় নষ্ট করার কারণে তার গীবতও মাকরূহ।

মাস'আলা ঃ গীবত যেমন কথা দ্বারা হয়, তেমনি কর্ম ও ইশারা দ্বারাও হয়। উদাহরণত খঞ্জকে হেয় করার উদ্দেশ্যে তার মত হেঁটে দেখানো।

মাস'আলা ঃ কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতে সব গীবতকেই হারাম করা হয়নি এবং কতক গীবতের অনুমতি আছে। উদাহরণত কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে কারও দোষ বর্ণনা করা জরুরী হলে তা গীবতের মধ্যে দাখিল নয়, তবে প্রয়োজন ও উপযোগিতাটি শরীয়তসম্মত হতে হবে। উদাহরণত কোন অত্যাচারীর অত্যাচার কাহিনী এমন ব্যক্তির সামনে বর্ণনা করা, যে তার অত্যাচার দূর করতে সক্ষম। কারও সন্তান ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে তার পিতা ও স্বামীর কাছে অভিযোগ করা, কোন ঘটনা সম্পর্কে ফতওয়া গ্রহণ করার জন্য ঘটনার বিবরণ দান করা, মুসলমানদেরকে কোন ব্যক্তির সাংসারিক অথবা পারলৌকিক অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য তার অবস্থা বর্ণনা করা, কোন ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গোনাহ্ করে এবং নিজের পাপাচারকে নিজেই প্রকাশ করে, তার কুকর্ম আলোচনা করাও গীবতের মধ্যে দাখিল নয়, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে নিজের সময় নষ্ট করার কারণে মাকরূহ। —(বয়ানুল কোরআন, রূহুল-মা'আনী) এসব মাস'আলায় অভিন্ন বিষয় এই যে, কারও দোষ আলোচনা করার উদ্দেশ্য তাকে হেয় করা না হওয়া চাই; বরং প্রয়োজনবশতই আলোচনা হওয়া চাই।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا

وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

(১৩) হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহিযগার। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মানব, আমি তোমাদের (সবাই)-কে এক পুরুষ ও এক নারী (অর্থাৎ আদম হাওয়া) থেকে সৃষ্টি করেছি। (তাই এদিক দিয়ে সব মানুষ সমান) এবং (এরপর যে পার্থক্য রেখেছেন যে) তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও (জাতির মধ্যে) বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছেন, (এটা শুধু এ জন্য) যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। (এতে অনেক উপযোগিতা রয়েছে। এজন্য নয় যে, তোমরা পরস্পরে গর্বিত হবে। কেননা) আল্লাহ্র কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহিযগার। (পরহিযগারীর পুরোপুরি অবস্থা কেউ জানে না, বরং এটা একমাত্র) আল্লাহ্ তা'আলা পুরোপুরি জানেন এবং পুরোপুরি খবর রাখেন (অতএব তোমরা কোন বংশমর্যাদা ও জাতিত্ব নিয়ে গর্ব করো না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উপরের আয়াতসমূহে মানবিক ও ইসলামী অধিকার এবং সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে ছয়টি বিষয়কে হারাম ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এগুলো পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণ হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে মানবিক সাম্যের একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা রয়েছে যে, কোন মানুষ অপর মানুষকে যেন নীচ ও ঘৃণ্য মনে না করে এবং নিজের বংশগত মর্যাদা, পরিবার, অথবা ধন-সম্পদ ইত্যাদির ভিত্তিতে গর্ব না করে। কেননা, এগুলো প্রকৃত-পক্ষে গর্বের বিষয় নয়। এই গর্বের কারণে পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাই বলা হয়েছে ঃ সব মানুষ একই পিতা-মাতার সন্তান হওয়ার দিক দিয়ে ভাই ভাই এবং পরিবার, গোত্র, অথবা ধন-দৌলতের দিক দিয়ে যে প্রভেদ আল্লাহ্ তা'আলা রেখেছেন, তা গর্বের জন্য নয়, পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য।

শানে-নুযূল ঃ এই আয়াত মক্কা বিজয়ের সময় তখন নাযিল হয়, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত বিলাল হাবশী (রা)-কে মুয়াযযিন নিযুক্ত করেন। এতে মক্কার অমুসলমান কোরাইশদের একজন বলল ঃ আল্লাহ্কে ধন্যবাদ যে, আমার পিতা পূর্বেই মারা গেছেন। তাকে এই কুদিন দেখতে হয়নি। হারেস ইবনে হিশাম বলল ঃ মুহাম্মদ কি মসজিদে-হারামে আযান দেওয়ার জন্য এই কাল কাক ব্যতীত অন্য কোন মানুষ পেলেন না? আবূ

সুফিয়ান বলল ঃ আমি কিছুই বলব না ; কারণ, আমার আশংকা হয় যে, আমি কিছু বললেই আকাশের মালিক তার (মুহাম্মদের) কাছে তা পৌঁছিয়ে দেবেন। এসব কথা-বার্তার পর জিবরাঈল (আ) আগমন করলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের সব কথাবার্তা বলে দিলেন। তিনি তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কি বলেছিলে ? অগত্যা তাদেরকে স্বীকার করতে হল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, গর্ব ও ইজ্জতের বিষয় প্রকৃতপক্ষে ঈমান ও তাকওয়া, যা তোমাদের মধ্যে নেই এবং হযরত বিলাল (রা)-এর মধ্যে আছে। তাই তিনি তোমাদের চাইতে উত্তম ও সম্ভ্রান্ত। ---(মাযহারী) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার হয়ে তওয়াফ করেন। (যাতে সবাই তাঁকে দেখতে পারে)। তওয়াফ শেষে তিনি এই ভাষণ দেন ঃ

الحمد لله الذى اذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها - الناس رجلان بر تقى كريم على الله وفاجر شقى هين على الله ثم تلا يا ايها الناس انا خلقناكم الاية -

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি অন্ধকার যুগের গর্ব ও অহংকার তোমাদের থেকে দূর করে দিয়েছেন। এখন সব মানুষ মাত্র দুই ভাগে বিভক্ত ঃ এক. সৎ, পরহিযগার ও আল্লাহ্‌র কাছে সম্ভ্রান্ত, দুই. পাপাচারী, হতভাগা ও আল্লাহ্‌র কাছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন।---(তিরমিযী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ দুনিয়ার মানুষের কাছে ইজ্জত হচ্ছে ধন-সম্পদের নাম এবং আল্লাহ্‌র কাছে ইজ্জত পরহিযগারীর নাম।

شُعُوبًا وَقَبَائِلَ শুঊব—شعوب শব্দটি شَعْب-এর বহুবচন। এর অর্থ এক মূল থেকে উদ্ভূত বিরাট দল, যার মধ্যে বিভিন্ন গোত্র ও পরিবার থাকে। বড় পরিবার এবং তার বিভিন্ন অংশের জন্যও আলাদা আলাদা নাম আছে। সর্ববৃহৎ অংশকে شعب এবং ক্ষুদ্রতম অংশ عشيرة বলা হয়। আবূ রওয়াফ বলেন ঃ অনারব জাতিসমূহের বংশ পরিচয় সংরক্ষিত নেই। তাদেরকে شعب বলা হয় এবং আরব জাতিসমূহের বংশ পরিচয় সংরক্ষিত আছে, তাদেরকে قبائل বলা হয়। اسباط শব্দটি বনী ইসরাঈলের জন্য ব্যবহৃত হয়।

বংশগত, দেশগত, অথবা ভাষাগত পার্থক্যের তাৎপর্য পারস্পরিক পরিচয় ঃ কোরআন পাক আলোচ্য আয়াতে ফুটিয়ে তুলেছে যে, যদিও আল্লাহ্ তা'আলা সব মানুষকে একই পিতা-মাতা থেকে সৃষ্টি করে ভাই ভাই করে দিয়েছেন, কিন্তু তিনিই তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছেন, যাতে মানুষের পরিচিতি ও সনাক্তকরণ সহজ হয়। উদাহরণত এক নামের দুই ব্যক্তি থাকলে পরিবারের পার্থক্য দ্বারা তাদের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে। মোটকথা, বংশগত পার্থক্যকে পরিচিতির জন্য ব্যবহার কর---গর্বের জন্য নয়।

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْ
لَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴﴾
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ
جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الصّٰدِقُوْنَ ﴿۱۵﴾ قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِى
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۶﴾ يَمُنُّوْنَ
عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ؕ قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَىَّ اِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ
اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۷﴾
اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸﴾

(১৪) মরুবাসীরা বলে ঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুন ঃ তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি ; বরং বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মেনি। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিষ্ফল করা হবে না। নিশ্চয়, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। (১৫) তারাই মু'মিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্র পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ। (১৬) বলুন ঃ তোমরা কি তোমাদের ধর্মপরায়ণতা সম্পর্কে আল্লাহ্কে অবহিত করছ ? অথচ আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে এবং যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (১৭) তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না। বরং আল্লাহ্ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাক। (১৮) আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয় জানেন। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(বনূ আসাদ প্রমুখ গোত্রের কতক) মরুবাসী (আপনার কাছে এসে ঈমানের দাবী করে। এ ব্যাপারে তারা কয়েকটি গোনাহ্ করে। এক. মিথ্যা ভাষণ ; কারণ,আন্তরিক বিশ্বাস ব্যতিরেকেই কেবল মুখে) বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি। আপনি বলে দিন ঃ তোমরা ঈমান আননি (কেননা, ঈমান আন্তরিক বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল, তা তোমাদের মধ্যে নেই, যেমন وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ বাক্যে বলা হবে) বরং বল, (আমরা বিরোধিতা ত্যাগ করে) বশ্যতা স্বীকার করেছি। (এই বশ্যতা স্বীকার অর্থাৎ বিরোধিতা পরিত্যাগ শুধু বাহ্যিক আনুকূল্যের মাধ্যমেও হয়ে যায়)। এখনও ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। (কাজেই ঈমানের দাবী করো না। যদিও এ পর্যন্ত ঈমান আননি, কিন্তু এখনও) যদি আল্লাহ্ ও রসূলের (সকল বিষয়ে) আনুগত্য স্বীকার কর (এবং আন্তরিকভাবে ঈমান আন) তবে তোমাদের (ঈমান পরবর্তী) কর্ম (শুধু অতীত কুফরের কারণে) বিন্দুমাত্র লাঘব করা হবে না (বরং পুরোপরি সওয়াব দেওয়া হবে)। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমতাশীল, পরম দয়ালু। (এখন শোন, কামিল মু'মিনকে, যাতে তোমরা মু'মিন হতে চাইলে তদ্রূপ হও) তারাই পুরোপরি মু'মিন যারা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর (তা সারা জীবন অব্যাহত রাখে, অর্থাৎ কখনও) সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্র পথে (অর্থাৎ ধর্মের জন্য) প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা সংগ্রাম করে। (জিহাদ ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত)। তারাই সত্যনিষ্ঠ (অর্থাৎ পুরোপুরি সত্যনিষ্ঠ। শুধু ঈমান থাকলেও সত্যনিষ্ঠ হতো। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কিছুই নেই ; অথচ তোমরা দাবী করছ পূর্ণ ঈমানের। সুতরাং তাদের এক মন্দ কর্ম তো হচ্ছে মিথ্যা ভাষণ, যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا ----وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ এবং দ্বিতীয় মন্দ কর্ম এই যে, তারা ধোঁকা দেয় ; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ অতএব) আপনি বলে দিন ঃ তোমরা কি তোমাদের ধর্ম (গ্রহণ করা) সম্পর্কে আল্লাহ্কে অবহিত করছ ? (অর্থাৎ আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা ধর্ম গ্রহণ করনি। এসত্ত্বেও যে, তোমরা ধর্ম গ্রহণ করার দাবী করছ, এতে জরুরী হয়ে যায় যে, আল্লাহ্র জ্ঞানের বিপরীতে তোমরা আল্লাহ্কে একথা বলে যাচ্ছ) অথচ (এটা অসম্ভব ; কেননা,) আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে এবং যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে এবং (এছাড়াও) আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (এ থেকে জানা যায় যে, তোমাদের ঈমান না আনার ব্যাপারে আল্লাহ্র জ্ঞানই নির্ভুল। তাদের তৃতীয় মন্দ কর্ম এই যে,) তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে (এটা চরম ধৃষ্টতা। ভাবখানা যেন এই যে, দেখুন আমরা নির্বিবাদে মুসলমান হয়ে গেছি। আর অন্যরা অনেক পেরেশান করে মুসলমান হয়েছে)। আপনি বলে দিন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ

মনে করো না। (কেননা, ধৃষ্টতা বাদ দিলেও তোমাদের মুসলমান হওয়াতে আমার কি উপকার হয়েছে এবং মুসলমান না হওয়াতে আমার কি ক্ষতি? তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদেরই পরকালের উপকার এবং মিথ্যাবাদী হলে তোমাদেরই ইহকালের উপকার আছে অর্থাৎ তোমরা হত্যা, কারাবাস ইত্যাদি থেকে বেঁচে গেছ। অতএব আমাকে ধন্য করেছ মনে করা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা)। বরং আল্লাহ্ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন। যদি তোমরা (ঈমানের এই দাবীতে) সত্যবাদী হও। (কেননা, ঈমান একটি বড় নিয়ামত, আল্লাহ্র শিক্ষা ও তওফীক ব্যতীত অর্জিত হয় না। এমন বড় নিয়ামত দান করেছেন, এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ। সুতরাং ধোঁকা ও ধন্য করেছ মনে করা থেকে বিরত হও। মনে রেখো,) আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব অদৃশ্য বিষয় জানেন। (এই ব্যাপক জ্ঞানের কারণে) তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তাও জানেন। (এই জ্ঞান অনুযায়ীই, তোমাদেরকে প্রতিদান দেবেন। অতএব তাঁর সামনে মিথ্যা বলার ফায়দা কি?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সম্মান ও আভিজাত্যের মাপকাঠি হচ্ছে পরহিযগারী। এই পরহিযগারী একটি অপ্রকাশ্য বিষয়, যা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। কোন ব্যক্তির পক্ষেই পবিত্রতার দাবী করা বৈধ নয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, ঈমানের আসল ভিত্তি হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাস। অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে শুধু মুখে নিজেকে মু'মিন বলা ঠিক নয়। সমগ্র সূরার প্রথমে নবী করীম (সা)-এর হক অতঃপর পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। উপসংহারে বলা হচ্ছে যে, আন্তরিক বিশ্বাস এবং আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যের উপরই পরকালে সৎকর্ম গ্রহণীয় হওয়ার ভিত্তি স্থাপিত।

শানে-নুযূল ঃ ইমাম বগভী (র)-র বর্ণনা অনুযায়ী আয়াত অবতরণের ঘটনা এই যে, বনূ আসাদের কতিপয় ব্যক্তি নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সময় মদীনায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়। তারা অন্তরগতভাবে মু'মিন ছিল না। শুধু সদকা-খয়রাত লাভের জন্য তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছিল। বাস্তবে মু'মিন না হওয়ার কারণে ইসলামী বিধি-বিধান ও রীতিনীতি সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ও বেখবর ছিল। মদীনার পথে ঘাটে তারা মলমূত্র ও আবর্জনা ছড়িয়ে দিল এবং বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়ে দিল। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে একে তো ঈমানের মিথ্যা দাবী করল, দ্বিতীয়ত তাঁকে ধোঁকা দিতে চাইল এবং তৃতীয়ত মুসলমান হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ধন্য করেছে বলে প্রকাশ করল। তারা বলল ঃ অন্যান্য লোক দীর্ঘকাল পর্যন্ত আপনার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে, অনেক যুদ্ধ করেছে, এরপর মুসলমান হয়েছে। কিন্তু আমরা কোনরূপ যুদ্ধ ছাড়াই আপনার কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়েছি। কাজেই আমাদের সদিচ্ছাকে মূল্য দেওয়া দরকার। এটা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শানে এক প্রকার ধৃষ্টতা। কারণ, এই মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করার পেছনে মুসলমানদের সদকা-খয়রাত দ্বারা নিজেদের দারিদ্র্য দূর করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। যদি তারা বাস্তবিকই খাঁটি মুসলমান হয়ে যেত, তবে এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নয়—স্বয়ং তাদেরই উপকার ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য

আয়াতসমূহ নাযিল হয় এবং তাদের মিথ্যা দাবী ও অনুগ্রহ প্রকাশের মুখোশ উন্মোচন করা হয়।

وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا ----তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না, শুধু বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে তারা মিথ্যা দাবী করছিল। তাই কোরআন তাদের ঈমান না থাকা এবং ঈমানের দাবী মিথ্যা হওয়ার কথা বর্ণনা করে বলেছে ঃ তোমাদের 'ঈমান এনেছি' বলা মিথ্যা। তোমরা বড় জোর اسلمنا 'ইসলাম কবূল করেছি' বলতে পার। কেননা, ইসলামর শাব্দিক অর্থ বাহ্যিক কাজেকর্মে আনুগত্য করা। তারা তাদের ঈমানের দাবী সত্য প্রতিপন্ন করার জন্য কিছু কাজকর্ম মুসলমানদের মত করতে শুরু করেছিল। তাই আক্ষরিক দিক দিয়ে এক প্রকার আনুগত্য হয়ে গিয়েছিল। অতএব আভিধানিক অর্থে اسلمنا বলা শুদ্ধ ছিল।

ইসলাম ও ঈমানে সম্পর্ক আছে কি ঃ উপরের বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ইসলামের আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে---পারিভাষিক অর্থ বোঝানো হয়নি। তাই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ হতে পারে না যে, ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে পারিভাষিক পার্থক্য আছে। পারিভাষিক ঈমান ও পারিভাষিক ইসলাম অর্থের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা। শরীয়তের পরিভাষায় অন্তরগত বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়, অর্থাৎ অন্তর দ্বারা আল্লাহ্‌র একত্ব ও রসূলের রিসালতকে সত্য জানা। পক্ষান্তরে বাহ্যিক কাজকর্মে আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যকে ইসলাম বলা হয়। কিন্তু শরীয়তে অন্তরগত বিশ্বাস ততক্ষণ ধর্তব্য নয়, যতক্ষণ তার প্রভাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজকর্মে প্রতিফলিত না হয়। এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে মুখে কালিমার স্বীকারোক্তি করা। এমনিভাবে ইসলাম বাহ্যিক কাজকর্মের নাম হলেও শরীয়তে ততক্ষণ ধর্তব্য নয়, যতক্ষণ অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি না হয়। অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে সেটা হবে 'নিফাক' তথা মুনাফিকী। এভাবে ইসলাম ও ঈমান সূচনা ও শেষ প্রান্তের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা। ঈমান অন্তর থেকে শুরু হয়ে বাহ্যিক কাজকর্ম পর্যন্ত পৌঁছে এবং ইসলাম বাহ্যিক কাজকর্ম থেকে শুরু হয়ে অন্তরের বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ইসলাম ও ঈমান একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঈমান ইসলাম ব্যতীত ধর্তব্য নয় এবং ইসলাম ঈমান ব্যতীত শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়তে এটা অসম্ভব যে, এক ব্যক্তি মুসলিম হবে---মু'মিন হবে না এবং মু'মিন হবে---মুসলিম হবে না। এটা পারিভাষিক ইসলাম ও ঈমানের বেলায়ই প্রযোজ্য। আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে এটা সম্ভব যে, এক ব্যক্তি মুসলিম হবে---মু'মিন হবে না ; যেমন মুনাফিকদের অবস্থা তাই ছিল। বাহ্যিক আনুগত্যের কারণে তাদেরকে মুসলিম বলা হত, কিন্তু অন্তরে ঈমান না থাকার কারণে তারা মু'মিন ছিল না